বিশুদ্ধবাণী

প্রথম ভাগ

শ্রীগুরু-স্মরণ

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

(১)

দেব দয়াময় দীন-শরণ্য
দৈবত দুর্ল্লভ-ভূতি বরেণ্য।
গন্ধ বিমোহিত সজ্জন চিত্ত
সর্ব্বজনৈরভিনন্দিত বৃত্ত ॥

হে দেব, হে দয়াময়, হে দীনের আশ্রয়, দেবদুর্লভ বিভূতির জন্য আপনি বরেণ্য। আপনার গাত্রগন্ধ সকল সজ্জনকে বিমোহিত করিত এবং সকল লোক আপনার স্বভাবের অভিনন্দন করিত।

(২)

শক্তিসনাথ-মহেশ্বর লীল
সঙ্কট-কণ্টক-মোচনশীল।
কেলি-কলা-কুতুকৈঃ কৃতহৃষ্টে
স্নেহ-বিমোচন-লোচন দৃষ্টে ॥

আপনার লীলা হইতেছে (মন্ত্রমহেশ্বর) শক্তি-সনাথ শিবেরই লীলা। কণ্টকরূপ সঙ্কট হইতে মোচন আপনার স্বভাব।

আপনি যেন খেলিতে খেলিতেই (অর্থাৎ বিনা আয়াসে) নানা দ্রব্য সৃষ্টি করিতেন এবং আপনার নয়নযুগল শিষ্যগণের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিত।

(৩)

বিপ্লবহীন-বিবোধ-সুবৃদ্ধ
শৈশব-সঙ্গত-কৌতুকসিদ্ধ।
রাজস-তামসবৃত্তি-বিমুক্ত
মঙ্গলমণ্ডিত-কর্ম্মণি যুক্ত ॥

আপনি বিচ্ছেদহীন প্রজ্ঞানে সুবৃদ্ধ ছিলেন, (তথাপি শিশুদিগের সঙ্গে) শৈশবোচিত কৌতুকেও পটু ছিলেন। রজোগুণের বা তমোগুণের কোনও বৃত্তি আপনাতে দেখা যায় নাই; আপনি মঙ্গলমণ্ডিত (সাত্ত্বিক) কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতেন।

(৪)

জ্ঞানসমুজ্জ্বল ভক্তিসমৃদ্ধ
যোগবিকাশিত-শক্তিভিরিদ্ধ।
ব্রহ্মপদে পরমে সুনিষণ্ণ
নিত্য-সমাধি-পদং প্রতিপন্ন ॥

আপনি জ্ঞানসমুজ্জ্বল ভক্তিতে সমৃদ্ধ এবং যোগ বিকাশিত শক্তিসমূহ দ্বারা দীপ্ত ছিলেন। আপনি পরমব্রহ্মপদে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অখণ্ড সমাধি (চৈতন্য সমাধি) সম্পন্ন ছিলেন।

(৫)

সংযমদীপ্তচরিত্র-মহিষ্ঠ
শৌচ-সদাচরণাস্থিতনিষ্ঠ।
ধ্যানধনিষ্ঠ-সুকীর্ত্তিগরিষ্ঠ
সুব্রত সুক্রিয় যোগিবরিষ্ঠ ॥

আপনার চরিত্র সংযমে দীপ্ত ছিল বলিয়া আপনি অতি মহান্, শুচিতা ও সদাচার নিষ্ঠাযুক্ত, ধ্যানধনে অতিমাত্র ধনী, সুকীর্ত্তিতে গরিষ্ঠ, সুব্রত, সৎক্রিয়াবান্ এবং যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(৬)

সদ্গুরু-গৌরব-শুভ্র-যশস্ক
শিষ্যহিতে সততং সমনস্ক।
যোগকলা-কলিত-গ্রহ-ভোগ
ভোগ-পরিগ্রহ-দূরিত-রোগ ॥

আপনার যশঃ সদ্গুরুর প্রাপ্য গৌরবে শুভ্র, (কেননা) আপনি শিষ্যগণের হিতে সর্ব্বদা মনোযোগী। যোগকলা (যোগ-জ্যোতিষ) দ্বারা আপনি তাহাদের গ্রহের ভোগ নির্ণয় করিয়া দিতেন এবং তাহাদের রোগের ভোগ স্বয়ং আকর্ষণ করিয়া নিয়া তাহাদিগকে নিরাময় করিতেন।

(৭)

মূর্দ্ধনি সংধৃত-শৈল-হরীশ
বক্ত্রবিলে কৃত-বিশ্ব-বিকাশ।
হিংসিত-বিক্ষির-জীবন-দান-
লব্ধ-বিদেশি-সুধীজন-মান ॥

আপনি মস্তকাভ্যন্তরে শিলাময় বিষ্ণু ও শিবকে (শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ) রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজ মুখবিবরে (ম, ম, সদাশিব মিশ্রকে) বিশ্বদর্শন করাইয়াছিলেন। একটি নিহত (চটক) পক্ষীকে জীবন দান করিয়া বিদেশীয় সুধীজন (Paul Brunton) হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮)

নাভি-বিলোত্থ-সনাল-সরোজ-
দর্শন-বিস্মিত-শিষ্য-সমাজ।
ব্যক্ত-দিবাকর-সংশ্রয়-বিত্ত
গর্ব্ববিনাকৃত-মত্যনবত্ত ॥

আপনার নাভিরন্ধ্র হইতে উত্থিত (অপূর্ব্ব) সনাল পদ্ম দর্শন করিয়া শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়াছিল। আপনি (তৎপূর্ব্বে অজ্ঞাত) সূর্য্যবিজ্ঞান প্রকাশ করেন। (এত শক্তি সত্ত্বেও) আপনি নিরভিমান ছিলেন বলিয়া আপনি কাহারও নিন্দাভাজন হন নাই।

(৯)

মাং স্মরসীহ নু শিষ্যমধন্যং
তুচ্ছতমং গুণবৎসু ন গণ্যম্।
দুর্ভর-দুষ্কৃতভার-নিপিষ্টং
দোষসমূহহতং হতদিষ্টম্ ॥

(হে গুরুদেব,) আপনার এই সুকৃতহীন শিষ্য আপনার স্মরণে আছে কি? (না থাকিবার সম্ভাবনা এই যে) আমি যে অতি তুচ্ছ ব্যক্তি—গুণবান্ শিষ্যদিগের মধ্যে গণ্য নহি। (পূর্ব্বজন্মের)

দুর্ভর পাপভারে নিপিষ্ট আমি (এ জন্মেও) বহু দোষে হত (দুষ্ট), সুতরাং দুর্ভাগ্য।

(১০)

প্রাপ্তকৃপোঽপি ন জাগরমাপ্ত-
স্তামসবৃত্তিবশোঽস্মি সুষুপ্তঃ।
তারয় মাং ভবতারণ তূর্ণং
গৌরবমস্তু তবাত্র চ পূর্ণম্॥

আমি (সদ্‌গুরুর—আপনার) কৃপা প্রাপ্ত হইলেও এখনও জাগি নাই—তামসিক বৃত্তির অধীন হইয়া গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্নই আছি। হে ভবতারণ, শীঘ্র আমাকে ত্রাণ করুন এবং তদ্দ্বারা এক্ষেত্রেও আপনার গৌরব পূর্ণ হউক।

সূচনা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

পরমারাধ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের পুণ্য স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ৺কাশীধাম হইতে "বিশুদ্ধবাণী" নামে একখানা গ্রন্থ নিয়মিতভাবে ধারাবাহিক প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প অনেক দিন হইতেই জাগিয়াছিল। কিন্তু নানা অন্তরায়বশতঃ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। আজ শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমাদের সম্মিলিত সৌভাগ্যের উদয়ে সেই শুভ সঙ্কল্প মূর্ত্তরূপ ধারণ করিয়াছে। তাই এই মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আমাদের সমুদয় ভ্রাতৃবৃন্দকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

'বিশুদ্ধবাণী' বিশুদ্ধ স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া ধারণ করিবে ও যথাশক্তি বহন করিবে। যে বিশুদ্ধসত্তা আমাদের জীবনের কর্ণধাররূপে—ভবপারের কাণ্ডারীরূপে—সমাগত, আমরা জানি সেই বিশুদ্ধসত্তাই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র কর্ণধার—"মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্ গুরুঃ", যিনি আমাদের গুরু তিনিই বিশ্বগুরু, যিনি বিশ্ব-গুরু তিনিই আমাদের গুরু। সুতরাং বিশুদ্ধ-স্মৃতি বলিতে আমরা শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের গুরুদেবের অধ্যাত্মজীবন সাধন ও সিদ্ধির ইতিহাস, তদুপদিষ্ট তত্ত্ব ও ক্রমনির্দ্দেশ, দেশ ও কাল-বিশেষে তৎপ্রদর্শিত লীলাবিভূতি প্রভৃতির স্মরণ ও আলোচনা

বুঝিব না, কিন্তু সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বদেশের ভগবদ্‌ভক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী ও কর্মনিষ্ঠ যোগিজনের সাধন, সিদ্ধি ও উপদেশও গ্রহণ করিব। কারণ সর্ব্বত্রই এক বিশুদ্ধ সত্তার খেলাই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মহাজনগণের অনুমোদিত অনুভবসিদ্ধ ও স্বসংবেদ্য মার্গ বা উপায়ের আলোচনাও আমাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করিব। মোটকথা, যে কোন আলোচনা মানব মাত্রের হিতকর ও লক্ষ্য-প্রাপ্তির অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার মধ্যে কোনটির প্রতিই বিশুদ্ধবাণী সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। চিত্তের অনুদার ভাব হইতেই নিজের অপরিগৃহীত বা অপরিচিত মত ও পথের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার উদয় হয়। এই সঙ্কোচময়ী দৃষ্টি বিশুদ্ধবাণীর মৌলিক আদর্শের প্রতিকূল। যেখানে সর্ব্বত্র আত্মভাবের প্রসার অভিপ্রেত সেখানে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসর কোথায়? জগতে বিরোধ আছে ইহা সত্য—বিচারক্ষেত্র, দর্শনশাস্ত্র ও ব্যবহারভূমি সর্ব্বত্রই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিরোধের মধ্যে অবিরুদ্ধ সত্যও আছে—বিশুদ্ধবাণী যথাসম্ভব বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে সেই অবিরুদ্ধ অংশই দেখিতে চেষ্টা করিবে। কারণ 'অবিভক্তং বিভক্তেষু'—ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ।

পূর্ণের পথে চলিতে হইলে লক্ষ্যটা প্রথম হইতেই পূর্ণের দিকেই রাখিতে হয়। পূর্ণেই সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। লক্ষ্য পূর্ণে থাকিলে ব্যবহারক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ ভাবের মধ্যেও মুক্ত সত্যের দর্শন পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাবন স্মৃতিতে সঞ্জীবিত ও রঞ্জিত হইয়া তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা সমগ্র বিশ্বকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব—'বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।'

বিশুদ্ধবাণী যোগীর বাণী। ইহার আদর্শ যোগীর আদর্শ। সুতরাং সাধনা, সিদ্ধি ও ভাবের প্রকার ভেদ যতই থাকুক সকলের মধ্যে সমভাবে একই মহা আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মূলে ও অন্তঃস্থলে অভিন্নভাবে যে **এক** রহিয়াছে সেই একেকে খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। তবেই ত বৈচিত্র্যের সার্থকতা সিদ্ধ হয়। কর্ম সত্য, জ্ঞানও সত্য ; সক্রিয় ও সগুণ সত্য, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণও সত্য ; সাকার সত্য, নিরাকারও সত্য ;—কিন্তু পরম সত্য তাহাই যেখানে কর্ম ও জ্ঞান, সক্রিয় ও অক্রিয়, সাকার ও নিরাকার একই অখণ্ড স্বরূপে প্রকাশমান হয়, শুধু যে একের দুইটি পরস্পর সংসৃষ্ট দিক্ বা পৃষ্ঠভূমিরূপে, তাহা নহে—কিন্তু একই অভিন্নরূপে।

বিজ্ঞান দৃষ্টিই সমন্বয় দৃষ্টি। রহস্যভেদ এই দৃষ্টিতেই হইতে পারে। কর্মের দৃষ্টিতে জগৎ সত্য, ভেদ সত্য, প্রতি ব্যক্তির মহিমা সত্য, আবার জ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা, ভেদ মিথ্যা, ব্যক্তিত্ব মিথ্যা। কিন্তু বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখা যায় যে এক সত্যই মহাসত্য। জ্ঞানে যাহা মিথ্যা প্রতীত হয় তাহা তৎ তৎদৃষ্টিতে মিথ্যা হইলেও একেরই স্বাতন্ত্র্য-কল্পিত লীলাময় অনন্ত আত্মপ্রকাশরূপে পরম সত্য। বস্তুতঃ এক ছাড়া ত আর কিছু নাই—লীলাতীতরূপে

যে এক স্থির ও চির শান্ত, লীলারূপে সেই একই অনন্ত প্রকারে অনন্ত সাজে চিরকল্লোলময়। বস্তুতঃ শান্ত ও অশান্তের ভেদের প্রশ্নই সেখানে নাই। সেখানে এক যে এক সে প্রশ্নও যেন উঠিবার অবকাশ পায় না। রহস্যভেদ ও সংশয়ভঞ্জন এই স্থানেই হইয়া থাকে। গ্রন্থিমুক্ত হৃদয় না হইলে এই মহাস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না।

ইষ্ট, গুরু ও আত্মা এক না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লান্তিময় যাত্রার অবসান নাই। চৈতন্যময় গুরুর কৃপাতে ইষ্টলাভ হয়, আনন্দরূপা শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় ও কৃপাসহকৃত নিজ কর্মবলে তাঁহার প্রাপ্তি ঘটে। তখন অনিষ্টের নিবৃত্তি হয়, দুঃখের অবসান ঘটে ও নিজের দুর্বলতা ঘুচিয়া যায়। মাতৃস্তন্য-নিঃসৃত অমৃতধারাতে অভিষিক্ত হইলে শক্তিসম্পদে ও ঐশ্বর্য্য-গৌরবে আনন্দময় রাজ্যের সিংহাসন নিজের অধিগত হয়। তাহার পর এমন অবস্থা আসে যখন এই সিংহাসনের গরিমাতেও আর আবদ্ধ থাকা চলে না। তখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অকিঞ্চনের ন্যায় আবার পথে বাহির হইতে হয়। যে পথিক পূর্বে গুরু-নির্দ্দিষ্টপথে তাঁহার কৃপা সম্বল করিয়া মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল, এবার সে মায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে গুরুকে খুঁজিতে বাহির হইল। পূর্ব্বে যে সে গুরুকে পাইয়াছিল তাহা ঠিক গুরুকে পাওয়া নহে। কারণ তাঁহাকে ত সে চায় নাই। চাহিতে না শিখিলে পাইতে পারা যায় না। তিনি দয়া করিয়া তখন তাহার কাছে আসিয়াছিলেন ছদ্মবেশে, স্বরূপে নহে; তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া তাহার ব্যথা দূর করিবার

জন্য আসিয়াছিলেন, আসিয়া আনন্দের বীজ-কণা দান করিয়া আনন্দভূমির পথ—মাকে পাওয়ার পথ—দেখাইয়া দিয়াছেন। আজ সে আনন্দময়—কারণ আনন্দময়ীরূপে মাকে সে পাইয়াছে।

মাই পূর্ণের সাকাররূপ। জগতে যেখানে যত আকার আছে —ইঁহারই অংশ, ইঁহারই কলা, ইঁহারই রশ্মি। সব রূপ এই পরম রূপেরই এক একটি ছটা মাত্র, সব রস এই পরম রসেরই কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র। গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—যেখানে যা আছে, সব ইঁহারই বিভূতি। বস্তুতঃ আমরা যে মূর্ত্ত বিগ্রহে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বিষয়ের রূপ রসাদি গ্রহণের জন্য নহে—মায়েরই রূপ রসাদি ধারণের জন্য। ভক্ত কবি বলিয়াছিলেন —"হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যে না পায় সে সম্বন্ধ, তার নাসা ভস্ত্রারই সমান।" বস্তুতঃ মা যে সর্ব্বেন্দ্রিয়বেদ্য তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব হয় এই মহাসাকার বিগ্রহের সাক্ষাৎকারে। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, লাবণ্য, যৌবন, করুণা, বাৎসল্য, স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি অনন্ত গুণরাশি সেখানে হিল্লোলিত হইতেছে।

দীর্ঘ সংসাররূপী মরু-কান্তার ভ্রমণে ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ প্রেমময়ী জগজ্জননীর সুশীতল অঙ্কে তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু পূর্ণের যাত্রীর পক্ষে এই বিশ্রামও সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। তাই ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। ঠিক **ত্যাগ** বলা চলে না, কারণ যোগীর ত্যাগ নাই—তবে ইহাকেও ছাড়াইয়া আগে চলিতে হয়।

তখন মা যেন অদৃশ্য হইয়া যান—নিজের আড়ালেই যেন

নিজেকে ঢাকিয়া ফেলেন। যাত্রীর সঙ্গে অভিন্ন রূপে থাকেন, কিন্তু আর পৃথক্ ভাবে দৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া দেখা দেন না। তখন যেন সন্তান আর সন্তান নয়, মাও যেন আর মা নন—যেন দুইই এক সত্তা।

এইবারকার যাত্রা বড় কঠিন, পথ বড় দুর্গম—কারণ চৈতন্যময় গুরু নিরাকার নির্গুণ ও নিষ্কল। কর্মের পথে মাকে পাওয়া যায়—তারপর জ্ঞানের আলোকে গুরুকে খুঁজিতে হয়। আনন্দেরও অতীত সত্তা আছে। যাহা চৈতন্যময় জাগ্রৎসত্তা সেখানে নিরানন্দ ত নাই-ই, আনন্দেরও হিল্লোল উঠে না। আনন্দও ত এক প্রকার মোহ—তৃপ্তিমোহ! যেটি শান্ত চৈতন্যময় মহাসত্তা সেইটি গুরু-সত্তা। এ পথে কৃপার বারিবর্ষণ হয় না—কৃপা-শূন্য অসহায় নিঃসম্বল যাত্রীকে একমাত্র নিজের অন্তঃসম্পদের উপর নির্ভর করিয়া অতিকষ্টে পথ অতিক্রম করিতে হয়। যে একদিন মহামায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া পরম ঐশ্বর্য্যময় আসনের অধিকারী হইয়াছিল আজ সেই রাজপুত্র সত্যই পথের কাঙ্গাল। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী ও অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহলক্ষ্মী সেই শিব আজ সত্যই পথের ভিখারী। নিরাকারের ধারণা অতি কঠিন। সাকারের মধ্যে নিরাকার আছে, সাকার রাজ্য অতিক্রম করার পরও সেই নিরাকারই যেন অনন্ত আকাশবৎ বিরাজমান থাকে। স্বয়ং নিরাকার না হইলে সেই নিরাকারের সাক্ষাৎকার হয় না। তখন সেই মহানিরাকার সত্তাতে সন্তান নিরাকার, মাও নিরাকার। ইহাই গুরু প্রাপ্তির একটি প্রধান দিক্। তখন একমাত্র গুরুই নিজের

মহাপ্রকাশে অখণ্ডরূপে বিরাজ করেন—এইটি অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন মহাব্যোমবৎ নিষ্কম্প নিঃস্পন্দ মহাসত্তা। গুরুপ্রাপ্তির পথটি অতি ভয়াবহ—মানস সরোবর হইতে মনোহর তীর্থ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ইহাই উর্দ্ধ মার্গ।

ইহার পর অতর্কিত এক মহাক্ষণে কৃপাশূন্য অবস্থা কাটিয়া যায়—গুরুর মহাকৃপাতে শিষ্য নিজেকে চিনিতে পারে। নিজে কে? স্বয়ম্। যিনি সকলের স্ব—মায়ের স্ব, গুরুর স্ব, যাত্রী শিষ্যেরও স্ব—সেই একই আত্মা সকলের আত্মা। ইহাই বিজ্ঞানের চরম রহস্য। ইহাই প্রকৃত আত্মলাভ। ইহাই স্বভাব। কর্মে মা, জ্ঞানে গুরু, বিজ্ঞানে স্বয়ম্। কর্মে সাকার, জ্ঞানে নিরাকার, বিজ্ঞানে সাকার-নিরাকার উভয়ের অতীত অথচ উভয়াত্মক। মা সাকার, গুরু নিরাকার—মা যখন গুরুর সহিত অভিন্ন তখন মাও নিরাকার, গুরু যখন মার সহিত অভিন্ন তখন গুরুও সাকার, কিন্তু বিজ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের ক্ষণে দেখা যায় আত্মা স্বয়ং সাকার নিরাকার উভয়ের অতীত হইয়াও যুগপৎ সাকার ও নিরাকার উভয় রূপেই প্রকাশমান। বস্তুতঃ আত্মাই গুরু—আত্মাই মা। তখন আত্মা ও নৈরাত্ম্যের দ্বন্দ্বও চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়।

তখন মা, গুরু ও স্বয়ম্—তিনেই এক, একেই তিন। বস্তুতঃ তিনই এক, একই তিন। তখন কর্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান অদ্বয়—মা, গুরু ও আত্মাও অদ্বয়। উপায় ও উপেয় অভিন্ন। দুইটি অদ্বয়তত্ত্ব বস্তুতঃ একই পরমাদ্বয় তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্ব।

ইহারও অতীত আছে। যদিও এই স্থিতি নিত্য বর্ত্তমান ও দেশ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাই **অতীত** বলা আর চলে না, তথাপি বলিতে হয়। অতীত আছে, অনাগতও আছে—নিত্য বর্ত্তমানেই সেটি ভাসে। এই স্থিতি অব্যক্ত—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। ইহা বাণীর অতীত—এমন কি **বিশুদ্ধ বাণীও** সেখানে উপনীত হয় না।

বিশুদ্ধ বাণীর কতটা দৃষ্টিক্ষেত্র তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হইল। কিন্তু ইহার প্রসারের মূলে আছে সেই উৎস, যাহা অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করে, মূককে বাচাল করে ও পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্। জয় গুরু।

বিশুদ্ধানন্দ মাহাত্ম্য

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

এক শ্রেণীর লোকের কাছে সাধু, বিশেষতঃ কোনও বেশধারী সাধু মাত্রেই যোগী। আর যোগী হইলেই তাহার যে নানা অলৌকিক সিদ্ধি থাকিবেই এ বিষয়েও তাহাদের সন্দেহ প্রায় দেখা যায় না। সেইজন্য সাধুমাত্রেরই কাছে রোগের ঔষধ, মোকদ্দমায় জয়, পুত্রের চাকরী বা স্থমতি, কন্যার বিবাহ বা সন্তান লাভ ইত্যাদির সমুচিত ব্যবস্থার আশায় লোকে ভিড় জমায়। সাধক বা সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই যে শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষাকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন ইহার তত্ত্ব সাধারণ লোকে বড় জানে না। ঈশ্বরের সহিত যাঁহার যোগ অর্থাৎ সংযোগ আছে সাধারণের ধারণা তিনিই যোগী এবং সেরূপ যোগ একবার স্থাপিত হইলেই ঈশ্বর হইতে অলৌকিক সিদ্ধিসকল আসিয়া পড়িবেই, ইহা সাধারণের কাছে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যিনি যত বড় সাধু তাঁহার ক্ষমতা তত অধিক হইবে—ইহাতে কাহারও সন্দেহ প্রায় দেখা যায় না।

ঈশ্বর বা পরতত্ত্বের সহিত সংযোগ স্থাপন যে সাধন মাত্রেরই উদ্দেশ্য ইহা অবশ্যই পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা জানেন সাধনেরও প্রকার ভেদ আছে। কেহ বুদ্ধি-প্রদীপ্ত

বিচার দ্বারা, কেহ ভক্তি-প্রণোদিত সেবা দ্বারা, কেহ দেহেন্দ্রিয়-শোধন-সমর্থিত ধ্যান দ্বারা, সেই সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেন। এইরূপে মোটের উপর এই ত্রিবিধ সাধন-ধারা অনুসারে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুর অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধদের শ্রেণী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে।

যেখানে শ্রেণী থাকে, সেখানে কোনটি উচ্চ আর কোনটি নীচ এই তর্কও উঠে। এইরূপ তর্ক নিয়া বিভিন্ন বাদীদের মধ্যে বহু জল্প বাদ বিতণ্ডা হইয়াছে এবং এখনও হয়। বহু গুরুগম্ভীর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যাহা পণ্ডিতেরা ও বিদ্যার্থীরা পড়েন এবং পড়িয়া জল্প বাদ বিতণ্ডার জন্য প্রস্তুত হন।

সাধারণ লোকের বিচারবুদ্ধি একটি মানই মানে। সেটি হইতেছে, যে সাধুর অলৌকিক সামর্থ্য বেশী সেই উচ্চ। এইরূপে তাহারা যেমন সকল সাধুকেই যোগী বলে, তেমনই তাহাদের মধ্যে উক্ত অর্থাৎ পণ্ডিতগণকৃত শ্রেণী বিভাগ অনুসারে যাহারা প্রকৃত যোগী তাহাদিগকেই তাহারা উচ্চতম স্থান দেয়। কেননা যোগীদিগেরই অলৌকিক সিদ্ধি বেশী।

সকল সাধন প্রণালীতেই আদিতে একটা উদ্যোগপর্ব্ব, মধ্যে যুদ্ধ পর্ব্ব বা ক্রিয়া পর্ব্ব, অন্তে শান্তি পর্ব্ব আছে। শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধি ও নিষ্ঠা সকল শ্রেণীরই প্রবেশিকা বলিয়া গণ্য, তারপর মার্গ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব অতিক্রম করিতে হয়।

জ্ঞান মার্গের উদ্যোগ পর্ব্বে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে

অর্থাৎ আত্মা ও দেহ, ঈশ্বর বা পরমাত্মা ও জগৎ, ইহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে তাহার উপলব্ধি, তৎপর ঐহিক ও পারত্রিক ফল-ভোগের প্রতি বৈরাগ্য এবং শম দম ইত্যাদি অনুশীলন করিতে হয়। ইহাতে একটা আনন্দ অবশ্যই আছে, পরন্তু কোনও শক্তির বিকাশ নাই বলিলেই চলে। ক্রিয়া পর্ব্বে বিচার এবং শান্তি পর্ব্বে জ্ঞানের পরিপাক ও অখণ্ড শান্তি ও বৈরাগ্য। শক্তির বা "সিদ্ধির" কথা এখানে বড় উঠে না।

ভক্তি-মার্গে উদ্যোগ পর্ব্বে সেবা আরম্ভ হয় শ্রীমন্দির মার্জ্জন ইত্যাদি দ্বারা, তারপর নাম-কীর্ত্তন। ক্রিয়া পর্ব্বে গভীরতর নাম সাধন, ইষ্টমূর্ত্তির ভোগরাগ, ইষ্টলীলা চিন্তনাদি। তারপর শান্তি পর্ব্বে আসে প্রেম-পরিপাক এবং অখণ্ড লীলা রসাস্বাদ। এখানেও শক্তির কথা উঠে না। ভক্ত সেবাই চান, শক্তি চান না।

যোগমার্গের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার উদ্যোগ পর্ব্ব যেমন দীর্ঘ ও দুরতিক্রম, তেমনই এক একটি ধাপ আয়ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অযাচিতভাবে শক্তি আসিতে থাকে। সাধনাবস্থায় যোগী ঐ সকল শক্তিতে সন্তুষ্ট থাকেন না, কারণ তাহাতে অগ্রগতিতে বাধা হয়। কিন্তু শক্তিগুলি থাকেই এবং পরার্থে প্রয়োগও চলে। সাধারণতঃ যোগ অষ্টাঙ্গ বলা হয়। ঐ অঙ্গগুলি একটির পর একটি ক্রমোর্দ্ধ স্তর বলা যায়। সর্ব্ব নিম্নস্তরে "যম" বা বহিরিন্দ্রিয় সংযম ; তাহার অর্থ হইতেছে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বা ভোগবিলাসাদির দ্রব্যাহরণে অনিচ্ছা। ইহার পরের

স্তরে "নিয়ম" বা অন্তরিন্দ্রিয় সংযম ; তাহার অর্থ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অর্থাৎ যোগশাস্ত্রাধ্যয়ন বা ইষ্টমন্ত্রজপ) এবং ঈশ্বর-প্রণিধান বা সকল কর্ম্ম পরম গুরুতে সমর্পণ। ইহার পর আছে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্গতি রোধ। এই পর্য্যন্ত উদ্যোগপর্ব্ব বলা যায়। তৎপর ক্রিয়া পর্ব্বে ধারণা (চিত্তকে একস্থানে স্থাপন), ধ্যান ও সমাধি। শান্তি পর্ব্বে সম্প্রদায় অনুসারে কৈবল্য, ঈশ্বর-সাযুজ্য, "মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের লীলা দেখা" ইত্যাদি।

যোগ মার্গে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক স্তর অতিক্রম বা আয়ত্তীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি অলৌকিক শক্তি আপনা হইতেই আসে। প্রবৃত্ত মাত্র যোগীকেও 'আমি এ সব চাই না' বলিয়া ন্যাকামি করিতে হয় না। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট হিংস্র জন্তুরা হিংসাত্যাগ করিবেই। 'ইহা চাই না' বলিবার অর্থ কি ? সত্যকথনের প্রতিষ্ঠায় বাক্‌সিদ্ধি আসিবেই, যোগীর মুখ হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা কার্য্যে অবশ্যই সত্য হইবে। অচৌর্য্যের ফলে সমস্ত ধনরত্ন আপনা হইতে উপস্থিত হইবে ; যোগী অবশ্য নিঃস্পৃহতা পোষণ করিয়াই চলিবেন। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় চিত্তের অসাধারণ সামর্থ্য, এবং অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় 'আমি প্রাক্তন জন্মে কে ছিলাম, কিরূপ ছিলাম, বর্ত্তমান জন্মেই বা আমার স্বরূপ কি, পরেই বা কি হইব' এই সকল জ্ঞান আপনা হইতে আসিবে। এইরূপ "নিয়মের" এক একটি ধাপ অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয়, আত্মদর্শনযোগ্যতা, অনুত্তম অর্থাৎ যৎপরোনাস্তি সুখলাভ, অণিমা লঘিমা ইত্যাদি

সিদ্ধি, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, ইষ্টদেবতা দর্শন, দেশান্তরে বা কালান্তরে ঘটিত যাহা জানিবার ইচ্ছা হয় তাহা যথার্থভাবে জানা—এই সকল শক্তি আসে। ইহার পর আসন ও প্রাণায়াম —এই দুইটি ব্যাপারে সিদ্ধি লাভ করিতেও বহু প্রযত্নের প্রয়োজন। ইহাতে সিদ্ধির ফল হইতেছে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহন ক্ষমতা এবং জ্ঞানের আবরক কর্ম্মের ক্ষয়। তৎপর প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের উপর অবাধ ক্ষমতা জন্মে।

এইরূপে দেখা যায় উদ্যোগপর্ব্বেই যোগ মার্গে প্রবৃত্ত সাধকের কতকগুলি শক্তি আসিয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত গুরু লাভ করে, সে যদি গুরুর উপর নির্ভর করিয়া বিপুল প্রযত্ন সহকারে ঐ পথে চলিতে থাকে তবে তাহার ঐ সকল শক্তি অখণ্ডভাবেই আসিবে।

তারপর ক্রিয়ার অবস্থা অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—ইহাতে সাফল্যে যে কি না হয় তাহা বলাই কঠিন। এই তিনটি ক্রিয়ার সমষ্টিগত নাম "সংযম"। সংযম দ্বারা জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ প্রাপ্তি ঘটে, যাহা জ্ঞানীর কাম্য হইলেও সব সময়ে অধিগম্য নয়।

এই ধরুন বস্তুর ত্রিবিধ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা) পরিণামে সংযম করিলে অতীত ও অনাগত জ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। শব্দ ও অর্থের ভাগ করিয়া তাহাতে সংযম করিলে প্রাণিমাত্রেরই উচ্চারিত শব্দের অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। সংস্কারে সংযম করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের জ্ঞান হয়। পরচিত্তে সংযমে

তাহা প্রত্যক্ষবৎ হয়, সে কি ভাবিতেছে তাহা জানা যায়। কায়গতরূপে সংযম করিলে দেহকে পরের অদৃশ্য করা যায়। সূর্য্যে সংযম করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাকেই বলে যোগীর ঐশ্বর্য্য। "ঐশ্বর্য্য" শব্দটি "ঈশ্বর" শব্দ হইতে উৎপন্ন—উহার অর্থ ঈশ্বরত্ব—ঈশ্বরের ভাব বা কর্ম্ম। এইজন্য বলা হয় যোগীই ঈশ্বর ঈশ্বরই যোগী। দেবতাদিগের মধ্যে শিব হইতেছেন ঈশ্বর, মহেশ্বর। তিনি যোগী। ঐশ্বর্য্যের অপর নাম বিভূতি। ঐ শব্দের লৌকিক ভস্ম অর্থ ধরিয়া বলা হয় মহেশ্বরের শরীর সর্ব্বদা বিভূতিতে লিপ্ত থাকে।

বাঙ্গালা দেশ এককালে ছিল শাক্ত যোগীদের দেশ,—তখন মহামহাশক্তিশালী যোগিগণ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৌদ্ধ যোগীও বহু ছিলেন। ভক্তিমার্গে যেমন নানা সম্প্রদায় ও শাখা আছে, সেইরূপ যোগমার্গেও বহু প্রস্থান অর্থাৎ সম্প্রদায় বা পথ আছে। সকলের সাধন প্রণালী একই বর্ত্ম ধরিয়া চলে না। কিন্তু সকল প্রস্থানেই শক্তিবিকাশের সুযোগ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত অন্য প্রদেশের সাধুরা বাঙ্গালী সাধুদিগের অলৌকিক শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিত। এখনও এই খ্যাতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি পরলোকগত কঠোর জ্ঞানবাদী সাধক সাধু শান্তিনাথ নিজ জীবন-কথার বিবরণে লিখিয়াছেন, অমরকণ্টকে নির্জন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্যে সাধন করিবার সময় ঐ অঞ্চলে সাধারণ লোকের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এই বাঙ্গালী সাধু ব্যাঘ্র হইয়া বনে বিচরণ করে। সেইজন্য তাহারা তাঁহাকে বাঘোয়া বাবা বলিত। অমরকণ্টকের কোনও

কোনও সাধুও যে ঐ ধারণা হইতে মুক্ত ছিল না তাহারও বিবরণ শান্তিনাথ স্ব-জীবন-কথায় দিয়াছেন।

সে যাহা হউক, চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শে বাঙ্গালাদেশে যোগ সাধনের স্থলে ভাবের বন্যা ও দলবদ্ধভাবে নাম কীর্ত্তনের নেশা আসিয়া পড়ে এবং ক্রমে যোগসিদ্ধির পরিবর্ত্তে অশ্রু, স্বেদ, কম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মান বলিয়া পরিচিত হয়। এমন কি জ্ঞান মার্গও অরসজ্ঞ কাকের আস্বাদ্য নিম্বফল বলিয়া নিন্দিত হইতে থাকে।

কিন্তু দেখা গিয়াছে ভক্তিপথে প্রবৃত্ত কোনও কোনও মহাপুরুষের মধ্যে দুই একটি শক্তির কাদাচিৎক পরিচয় পাওয়া গেলে, যোগবিভূতির নিন্দাকারী তদীয় ভক্তগণ তাহাই পুনঃ পুনঃ ফলাও করিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে যোগী কম আবির্ভূত হইলেও, অনেক যোগী আছেন এবং যোগীদিগের স্বভাব অনুসারে প্রায়শঃ তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবেই থাকেন। সম্প্রতি পরলোকগত বরদাচরণ মজুমদার ইঁহাদের একজন। মৃত্যুর পর তাঁহার কথা একখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি সকলের নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিলেন। প্রচ্ছন্ন যোগিগণের নাম কদাচিৎ কোনও ঘটনাসূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাহারও কাহারও নাম তিরোভাবের পরে প্রকাশ পায়।

তিন জন বাঙ্গালী মহাযোগীর নাম একান্তই প্রচ্ছন্ন থাকিবার যোগ্য ছিল না বলিয়া তাঁহাদের জীবদ্দশায় খুব ব্যাপকভাবে না

হইলেও প্রকাশ হইয়াছিল। ইহারা কেহই আত্ম-প্রচার ইচ্ছা বা অনুমোদন করিতেন না। এই তিন জন হইতেছেন— (১) কাশীর শ্যামাচরণ লাহিড়ী, (২) বারদির লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ও (৩) বর্দ্ধমানের ও পরে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস।

ইহাদের মধ্যে এক শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দকেই দেখিয়াছি। অন্য দুইজনকে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচ্ছন্ন যোগী শিষ্য দুই একজনের নাম শুনিয়াছি। লাহিড়ী মহাশয় ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্পর্কেও অল্প কথাই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তবে তাঁহারা যে অত্যুন্নত যোগী ছিলেন ইহা বাবা বিশুদ্ধানন্দের মুখে শুনিয়াছি। অবাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি গোরক্ষপুরের গম্ভীরনাথ ও কাশীর তৈলঙ্গ স্বামীকে যোগিরূপে মান্য করিতেন।

বাবা বিশুদ্ধানন্দের যে কত শক্তি ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহার কারণ তিনি ১৪ বৎসর মাত্র বয়স হইতে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর কাল তিব্বতে জ্ঞানগঞ্জ নামক বহু প্রাচীন একটি যোগাশ্রমে শত শত বর্ষজীবী যোগিগণের শিক্ষা ও পরিচালনাধীন থাকিয়া স্ব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত (অনেকগুলি অন্য সম্প্রদায়ে অজ্ঞাত) সকল প্রকার যোগক্রিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তদুপরি সূর্য্য-বিজ্ঞান নামে এক অতি প্রাচীন ও অতি রহস্য (এবং অন্য সম্প্রদায়ে সম্পুর্ণ অজ্ঞাত) বিজ্ঞান শুধু শিক্ষাই করেন নাই, সে বিষয়ে জীবনব্যাপী গবেষণাও করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণকে তাহার অমৃতময় ফল বিতরণ করিবার তাঁহার যে ইচ্ছা ছিল, বিধাতার ইচ্ছায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা সকল শক্তির মধ্যে সুদুর্লভ সৃষ্টিশক্তি লাভ করা যায়। একখানি লেন্‌স্ (lens) এর সাহায্যে সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা বাবা বিশুদ্ধানন্দ যে কত বিচিত্র রকমের বস্তু প্রায়ই চক্ষের নিমেষে সৃষ্টি করিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার শিষ্য মাত্রেই, এবং অশিষ্যও অনেকে, এমন কি জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ও ব্রিটিশ ভ্রমণকারী বা সাংবাদিকেরাও, উহার কিছু কিছু দর্শন করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পুস্তকে বা সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশও করিয়াছেন।

এই যে সৃষ্টি-ক্ষমতা ইহা ঐশ্বরিক ক্ষমতা—প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। বাগ্মিতাবলে চিত্তরঞ্জক ভাবে ধর্ম্মকথা খ্যাপন, বিদ্যাবলে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ, ভাবের প্রাচুর্য্যে কীর্ত্তনে নর্ত্তন বা গান গাহিয়া লোককে মাতান উহার তুলনায় নগণ্য, যদিও ইহার কোনও কোনওটি সাধুত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয় এবং দীক্ষার্থীও আকর্ষণ করে। তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের রীতিতে demonstration করিতে কাহাকে দেখা যায়? যোগ-শাস্ত্রের "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্" এ তত্ত্ব সকলেই শুনিয়াছেন, অনেকে যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাও করিয়াছেন ও করেন, কিন্তু হাতে হাতে একটা গোলাপ ফুলকে জবায়, একটা জবাকে প্রবালে, একটা বেলফুলকে স্ফটিকগোলকে পরিণত করিয়া কয় জন দেখাইয়াছেন? অথচ বাবা বিশুদ্ধানন্দ ইহা হরদম করিতেন। তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বাপু, একটা ঘাসের ডগা নির্ম্মাণ করিতে পারে এরূপ একটি লোক আমাকে দেখাও না।" তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জাম গাছে, ভেরেণ্ডা গাছে আঙ্গুর ফলাইয়াছেন, একটা

জবাগাছকে চিরদিনের মত গোলাপ গাছে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। একটি মার্কিণ সাংবাদিককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া লেন্‌সের সাহায্যে একটা শুক্‌না কাঠের অর্দ্ধাংশ মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তরে পরিণত করিয়াছিলেন, অন্য এক য়ুরোপীয় দর্শকের স্বহস্ত-নিহত চড়াই পাখীকে পুনর্জীবন দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন,—"অণিমা ও মহিমা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন আঙ্গুল মোটা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। * * * হীরক, সুবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শত শত প্রকারের বস্তুর নির্ম্মাণ-ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জীবের মধ্যে মাছি, চামচিকা প্রভৃতি জীবজন্তু তৈয়ার করিতে দেখিয়াছি।"

তাঁহার বিভূতির সীমা পরিসীমা ছিল না বলিলেই চলে। শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখ-বিবরে যশোদাকে বিশ্ব দর্শন করাইয়াছিলেন, ইহা পুরাণে আছে। বাবা বিশুদ্ধানন্দ কথা-প্রসঙ্গে স্বল্প-পরিমাণ স্থানে বিশ্ব-দর্শনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন পুরীর পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্রকে স্বমুখ-বিবরে বিশ্ব দর্শন করাইয়া তাঁহার সংশয় অপনোদন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর পদ্মনাভ নাম পুরাণ-প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাভি হইতে উদ্‌গত সনাল পদ্ম মধ্যে পুরাণানুযায়ী ব্রহ্মার চিত্র বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। সকলেরই নাভিতে যে পদ্ম আছে তাহা বাবা বিশুদ্ধানন্দ একাধিক দিন স্ব-নাভি বিস্ফারিত করিয়া তাহা হইতে সনাল পদ্ম বাহির করিয়া শিষ্যগণকে দেখাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের রীতিতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা। ইহাতে বেশী বাগ্‌বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয় না, ভাবে গলিয়া শ্রোতাকে গলাইবার

প্রয়োজন নাই; অথচ দর্শক ও জিজ্ঞাসু সংছিন্ন-সংশয় হইয়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত সকল অপরিমেয় শক্তি সত্ত্বেও বাবাজী প্রচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন এবং অনেকটা ছিলেনও প্রচ্ছন্নভাবে। তিনি আশ্রমে কৌতূহলী দর্শকের আনাগোনা পছন্দ করিতেন না। অধিকারী ভিন্ন সকলকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া বাক্‌শক্তির অপচয় করিতেন না। আশ্রমে ঘটা করিয়া কীর্ত্তন বা দরিদ্র-ভোজনের আয়োজন করিয়া লোক আকর্ষণ করিতেন না। কেবল শিষ্যগণের কল্যাণে তিনি আশ্রমে নানা পর্ব্বে কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন এবং তদুপলক্ষে আহুত অনাহুত শত শত কুমারী সেবা পাইতেন। তিনি সাক্ষাৎ দেখিতেন এবং শাস্ত্রেও ইহার সমর্থন আছে যে, কুমারী কন্যারা জগতের অসঙ্গা আদিজননীরই প্রতিনিধি।

অনেকেরই ধারণা আছে জ্ঞানীরা নীরস প্রকৃতির এবং যোগীরা কঠোর প্রকৃতির লোক; কেবল ভক্তেরাই রসে ভরপূর। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ ভগবানের মাধুর্য্য চিন্তায় সর্ব্বদা মস্‌গুল থাকেন বলিয়া তাঁহাদের প্রকৃতিও মধুর হইয়া যায়। বৈষ্ণবগণের এই খ্যাতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে জ্ঞানীকে নীরস এবং যোগীকে কঠোর হইতেই হইবে এরূপ কোনও নিয়ম নাই। জ্ঞানমার্গে সাধককে হর্ষামর্ষ উভয়ই ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সুন্দরের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হইবে না বা দয়া পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে,

এরূপ কোনও বিধি নাই—সবই জ্ঞান-প্রদীপ্ত ভাবে করিতে হইবে, কেবল চিত্তচঞ্চলকারী ভাবের আবেগে নয়, ইহাই তাহাদের শিক্ষণীয় ও আচরণীয়। যোগী সম্বন্ধেও উহাই বলা যায়। পরম-তত্ত্ব অরূপ অথচ বিশ্বরূপ, নিরাকার অথচ সর্ব্বাকার। তাহাতে সর্ব্বরসের সমন্বয় রহিয়াছে। রসো বৈ সঃ। যিনি তাঁহাকে নিবিড়-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিও সকল রসে নিষ্ণাত হইবেন। যোগীর ঐশ্বর্য্যে অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে বা তত্তুল্যতায় কি ঈশ্বরের মাধুর্য্যের স্থান নাই? যোগী যে ঈশ্বরবৎ পূর্ণ, তাঁহাতে কোনও রূপ অপূর্ণতা থাকিবে কি করিয়া? তবে মাধুর্য্যের যে একটা অর্থ বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত তাহার অসংযত চর্চ্চায় গ্রাম্যধর্ম্মের দিকে প্রবণতা আসিতে পারে এবং বহু স্থলে আসিতেও দেখা গিয়াছে। বিষয়টির অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। যোগী বা জ্ঞানী ঈশ্বর সম্পর্কেও সেরূপ মাধুর্য্য চর্চ্চার সমর্থন করেন না। কেননা পথটা পিচ্ছিল। প্রকৃত ভক্তেরা ঈশ্বর সম্পর্কেই সেরূপ মাধুর্য্য চর্চ্চা নিবদ্ধ রাখেন। অন্য ক্ষেত্রে উহার নিন্দা বৈষ্ণবশাস্ত্রেও প্রসিদ্ধ। তবে পথের পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে ভাবপ্রবণ সাধকের সর্ব্বদা সাবধান থাকা কঠিন, এ বিষয়ে বোধ করি সকলে সম্যক্ সতর্ক নহেন।

সে যাহা হউক, আমরা শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতে বসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি এই মহাযোগী যদিও অনেক সময়ে শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়াও নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন এবং শিষ্যদিগকে নীরবে সচ্চিন্তা করিবার সুযোগ দিতেন, তথাপি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে প্রচুর হাস্যরস ও

অন্যান্য রস অবতারণ ও বিতরণ করিতেন। তিনি ষড়্‌রসে রসিক ছিলেন। তাঁহার হাস্যরস যেমন ছিল শিষ্যগণের মনোরঞ্জনার্থ, তেমনই ক্রোধও ছিল তাহাদের কল্যাণার্থ। তিনি যেমন অতি অল্প কথায় লোককে হাসাইতে পারিতেন তেমনই অতি অল্প কথায় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতেন। আর তাহার ফল তিক্ততাবর্জ্জিত ছিল বলিয়া তাঁহার ক্রোধ রসাঙ্গই ছিল। তিনি চল্‌তি ভাষায়ই কথা বলিতেন, তাহাতে কৃত্রিমতাও যেমন থাকিত না, গ্রাম্যতাও তেমনই থাকিত না। তাঁহার কোনও আচরণেই কৃত্রিমতার বা লোক-দেখানো ভাবের লেশমাত্রও ছিল না।

কঠোরতা যোগের অপরিহার্য্য দোষ নয়। কোনও যোগীতে যদি কঠোরতা দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রকৃতির ছাপ রহিয়াছে অথবা যাহা আরও অধিক সত্য হওয়া সম্ভব, উহা প্রয়োজনাধীনরূপে কৃত্রিম। যোগী কখনও দয়া মায়াহীন হইতে পারেন না। বাহিরের কঠিন আবরণের অন্তরালে প্রচুর করুণা ও সহানুভূতি তাঁহাতে থাকিবেই। কেননা চিত্তের পরিকর্ম্ম বা পরিমার্জ্জন বা মলাপনয়নের সাধনরূপে তাঁহাকে যে পরের সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে মৈত্রী, দুঃখ দেখিয়া করুণা, পুণ্য দেখিয়া মুদিতা (হর্ষ), এবং পাপ দেখিয়া ঘৃণা বা বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা অভ্যাস করিতে হইয়াছে। বাবা বিশুদ্ধানন্দে এ সকলই প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ছিল অতি কোমল। মুখে ঔদাসীন্য এমন কি বিরক্তি প্রকাশ করিলেও শিষ্যের দুঃখে, রোগে, কষ্টে সমুচিত

ব্যবস্থা অবলম্বন তিনি অনেক সময়ে তাহার অজ্ঞাতসারেই করিতেন, অনেক সময়ে অযাচিত হইয়াও করিতেন। তিনি বহু বহুবার রোগীর রোগ নিজে টানিয়া নিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়াছেন বা তাহার ক্লেশের প্রচুর লাঘব করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐভাবে তিনি নিজ জীবনই দান করিয়াছেন। চরিত্রের ঔদার্য্য মাধুর্য্য ইহা অপেক্ষা অধিক কি কল্পনা করা যায়? শিষ্যেরা ছিল তাঁহার প্রাণ। 'আমি সমস্ত জগদ্বাসীর উপকার করিতেছি', এমন ছেঁদো কথা তিনি কখনই বলিতেন না। কিন্তু তাঁহার জীবন ছিল জগতের শিক্ষার স্থল। বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুক এরূপ আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনও করেন নাই। অথচ তাঁহার কৃপার টানে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন শত শত লোক তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছে। তিনি রাজা রাণীর দীক্ষাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের প্রার্থনায় উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত দীক্ষা দেনও নাই। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে ধনী ও মানী এবং অত্যুচ্চ শিক্ষিত লোক ত ছিলই, বরং মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত এবং মধ্যবিদ্য ও অল্পবিদ্য লোকই অধিক ছিল।

তাঁহার চরিত্রের এক মধুর ধর্ম্ম এই ছিল যে, তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। শিষ্য হউক, অশিষ্য হউক, গুণীর আদর করিতে তিনি কখনই ত্রুটি করিতেন না। উদাহরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ আরও বেশী দীর্ঘ হইবে। শিষ্যদের যৎসামান্য গুণ তিনি অতি আদরের চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করিতেন না।

বালক বালিকারা ছিল তাঁহার অতি প্রিয়। তাহাদের সঙ্গে তিনি কত হাসি কৌতুকই না করিতেন। ইহাতেও সময় সময় তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইত। একটি ৮।৯ বৎসরের কুমারী একদিন তাঁহাকে বলে, "বাবা, কাল রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি আপনাকে যেন কোলে নিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাকে একটু অন্তরালে নিয়া সোলার মত হাল্‌কা হইয়া তাহার কোলে উঠেন। কিছুক্ষণ পরে সেই লঘুত্ব সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বালিকাটি তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সকলের নিকট আসিয়া সেই কথা বলে। বস্তুতঃ মাধুর্য্য যে ঐশ্বর্য্যেরই অঙ্গ একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাধুর্য্য, সামর্থ্য, জ্ঞান, প্রেম সব নিয়াই ঐশ্বর্য্য, যাহা যোগীর বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত।

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের সকল মাহাত্ম্যের সমুচিত বর্ণনা বা বিশ্লেষণ আমার সামর্থ্যের অতীত। আর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। আমি দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিলাম। পাঠকগণ আমার অযোগ্যতা ও ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন।

দেহ ও কর্ম

(প্রথম প্রস্তাব)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন, "শরীরং কেবলং কর্ম শোকমোহাদি-বর্জিতম্।" কর্ম হইতে শরীর হয় ইহা যেমন সত্য, তদ্রূপ কর্মের জন্যই শরীর ইহাও তেমনি সত্য। শরীর ব্যতীত কর্মও হয় না, ভোগও হয় না। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য শরীর গ্রহণ করিতে হয় এবং যতদিন শরীর দ্বারা ঐ ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন শরীর-ধারণ আবশ্যক হয়। ভোগ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীর-পাত ঘটিয়া থাকে। জাতি, আয়ু ও ভোগ এই তিনটি প্রারব্ধের ফল। দেহ-সম্বন্ধই জাতি বা জন্ম এবং এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই মৃত্যু। উভয়ের অন্তরালবর্ত্তী সময়টি উক্ত সম্বন্ধের স্থিতিকাল। উহাকেই প্রচলিত ভাষাতে আয়ু বলা হয়। সুখ ও দুঃখ, যাহা নিজের নিয়ত-বিপাক প্রাক্তন কর্মবশতঃ আপতিত হয় তাহা বিনা বিচারে ভোগ করিয়া যাইতে হয়। তবেই উহা কাটিতে পারে। নতুবা ভোগকালেও অভিনব কর্মবীজ সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

যে দেহ দ্বারা কর্ম করা হয় তাহা কর্মদেহ, যে দেহ দ্বারা কর্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করা হয় তাহা ভোগদেহ, এবং যে দেহে একই সঙ্গে কর্মও হয় ভোগও হয় তাহা মিশ্রদেহ। সাধারণতঃ

কামধাতুর দেবাদির, তির্য্যগাদির, প্রেতযোনির, অসুরাদি ও নরকবাসী জীবের দেহ ভোগদেহ। মানুষের দেহ কর্মদেহ ও ভোগদেহ উভয়ই। কর্ম করিয়া অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে—অন্য প্রাণীর সে সামর্থ্য নাই। তাই মানুষের এত গৌরব। তত্ত্ববিদ্‌গণ সেইজন্য নরদেহের এত বেশী মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ-সংশ্রয়—এই তিনটিকে জীবনের দুর্লভ সম্পৎ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদও

"মনরে, তুমি কৃষিকাজ জান না,—
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা,"

বলিয়া তাঁহার অমর সঙ্গীতে মনুষ্য-দেহেরই উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। এই যে 'কৃষিকাজের' কথা বলা হইয়াছে ইহারই নাম কর্ম—মানব দেহকে আশ্রয় করিয়া মনের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাই মানব দেহের এত মহত্ত্ব। প্রকৃতির নিয়মে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব সর্ব্বশেষে মনুষ্য-দেহই প্রাপ্ত হয়। তখন সে কর্মের অধিকারী হয় ও অধ্যাত্ম-যাত্রার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে। তাই হংস গীতাতে আছে—"গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"। অবিবেকের বশে ভোগ-বাসনা দ্বারা চালিত মানুষ অসংযত জীবন যাপন করিয়া দীর্ঘকাল কৃত কর্মের ফলভোগের জন্য অনুরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হয় এবং এইভাবে অধঃ, উর্দ্ধ ও মধ্যলোক ভ্রমণ

করিতে করিতে কদাচিৎ ভোগকালের অবসান মুখে ভাগ্যবশতঃ বিবেকের উদয়ে বিশুদ্ধ কর্ম করিতে সমর্থ হয়। যোগরূপ কর্মই বিশুদ্ধ কর্ম জানিতে হইবে। শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র. এই তিন প্রকার কর্ম হইতে তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকার গতিলাভ হয়। শুক্ল কর্মই পুণ্য—যাহার ফলে দেবলোকে দেবদেহ ধারণ করিয়া বাসনানুসারে আনন্দভোগের অধিকার জন্মে। তদ্রূপ কৃষ্ণ কর্ম বা পাপের ফলে অধোলোকে গতি হয় ও দুঃখভোগ হয়। মিশ্র কর্মে মধ্যলোকে মনুষ্য-দেহ লাভ হয়। কিন্তু যতক্ষণ অশুক্ল ও অকৃষ্ণ কর্ম অনুষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ মানব-দেহের সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। পুণ্য বা পাপের জন্য নরদেহ গ্রহণ করা হয় নাই—পুণ্য-পাপের অতীত শুদ্ধ আত্মকর্মের জন্যই এ দেহ ধারণ করা হইয়াছে। যতদিন তাহা না হইবে ততদিন লোক লোকান্তরে ভ্রমণ করিলেও স্থূল মানবদেহের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

মনুষ্যদেহই কর্ম্মানুযায়িনী গতির সূত্র। এইখান হইতে ঊর্দ্ধেও যাওয়া যায়, অধঃতেও যাওয়া যায়, বিশ্বের সর্ব্বত্র যাওয়ার পথ পাওয়া যায়। আবার ভাগ্য থাকিলে এইখান হইতেই কর্ম-প্রভাবে এমন পথ পাওয়া যায় যাহা আশ্রয় করিলে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

"যোনেঃ শরীরম্"—যোনি হইতে শরীর উদ্ভূত হয়। নরযোনি শ্রেষ্ঠ যোনি—নরদেহ শ্রেষ্ঠ দেহ। এই দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। যাহা কিছু বাহ্য জগতে আছে তাহা সবই মানুষের দেহে আছে। অতি গভীর পাতাল-রাজ্যের নিম্নস্থ গাঢ়তম অন্ধকার হইতে ঊর্দ্ধতম মহাব্যোমের পরিস্ফুট চিদালোক পর্য্যন্ত

এই দেহে বিরাজ করিতেছে—কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবীর দেহ মাটীর দেহ, তাহা সত্য, তথাপি ইহাতে প্রকৃতির সকল তত্ত্বই নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আত্মার বা পুরুষের ভোগ ও সেবার জন্য এবং কর্মের জন্য যাহা আবশ্যক সবই দেহে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়—কারণ মন ও প্রাণের দ্বারা ইহাকে যথাবিধি কর্ষণ করিয়া ইহাতে গুরুদত্ত বীজ বপন করিতে পারিলে ইহা হইতে কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি হয় যাহা যথাসময়ে অমৃত ফল প্রসব করে।

চেতন ও অচেতন উভয় সত্তার সংঘর্ষে দেহ উৎপন্ন হয়। লিঙ্গ ও যোনির পরস্পর সন্নিকর্ষ হইতে ইহা জাত হয়। লিঙ্গ অলিঙ্গের চিহ্ন মাত্র। মহালিঙ্গ ও মহাযোনি মূলতঃ এক হইলেও ব্যক্তভাবে লিঙ্গে ও যোনিতে তারতম্য আছে এবং এই তারতম্য-মূলক ক্রমিক উৎকর্ষসম্পন্ন ৮৪ লক্ষ স্তর ও তদনুরূপ ৮৪ লক্ষ দেহ বিদ্যমান আছে। বিশুদ্ধ অহংভাবের বিকাশের জন্য প্রকৃতির বিশাল বিজ্ঞানশালাতে এই বিবর্ত্তনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। মূল অব্যক্ত সত্তা হইতে শক্তির স্পন্দনে অন্নময় সত্তার আবির্ভাব হয়। অন্নময় সত্তা হইতে প্রাণময় সত্তার বিকাশ ও প্রাণময় সত্তা হইতে মনোময় সত্তার অভিব্যক্তি এই বিবর্ত্তনের অন্তর্গত। সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও ক্রমবিকাশ জানিতে হইবে।

মানবদেহের বিকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক প্রেরণা হইতেই আপনা আপনি বিকাশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। "God made Man after His own Image" যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যদেহই ভগবৎ স্বরূপের প্রতীক বা আভাস।

মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণ ভগবত্তার অভিব্যক্তি হয়। নররূপী আধার ভিন্ন অন্য কোন আধারে অর্থাৎ পশু আদির আধারে দিব্যশক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। অবতারাদির ব্যাপার অন্যরূপ। ভক্ত রামপ্রসাদ যাহাকে কৃষিকার্য্য বলিয়াছেন তাহা একমাত্র এই নরদেহেই সম্ভবপর হয়, কারণ এই দেহেই অহং-ভাবের প্রথম স্ফূর্ত্তি হয় এবং এই দেহেই অহং-ভাবের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। সমস্ত জড় ও জীব জগতের সমষ্টি-সত্তা ঘনীভূত হইয়া মানবদেহ রচিত হয়। মনের ও অহং-ভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি বৈখরীরূপে এই দেহেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ইহাই প্রজ্ঞার বীজ। বর্ণাত্মক শব্দের ক্রিয়া এবং বর্ণাত্মক শব্দের বিলয়ন ব্যাপার উভয়ই এই দেহেই হইয়া থাকে। নাদ ও জ্যোতি যে বিন্দু হইতে ফোটে তাহার প্রথম সূচনা মানবদেহেই পাওয়া যায়। এই দেহেই বন্ধন বোধ হয় বলিয়া এই দেহেই মুক্তি সম্ভবপর। কুণ্ডলিনীর স্থিতি এই দেহেই আছে। সুষুম্না নাড়ী ও ষট্‌চক্রের অবস্থান মানবেতর যোনিতে যথাবৎ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস অন্য দেহে সম্ভবপর নয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি পশু প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে, কিন্তু তুরীয় ও তুরীয়াতীত একমাত্র মানবেই সম্ভবে। এইজন্য কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যোগের অভ্যাসও শুধু এই মানবদেহেই হইতে পারে।

প্রকৃত দিব্যদেহ যাহা তাহা মানবদেহেরই বিকাশ মাত্র। মানবদেহই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পরিণতি-সাধনে যে উপায় অনুসৃত হয় তাহারই নাম কর্ম।

দেহে চৈতন্য ও জড় সত্তা মিলিতভাবে বিদ্যমান। মানবেতর দেহেও যেমন, মানবদেহেও ঠিক তেমনি। কিন্তু নিম্নদেহে অহং-ভাবের অবয়বরূপ রশ্মিপুঞ্জ ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিস্ফুট হয় না। এই সকল রশ্মি দেহস্থ কমলের দলে দলে আপন স্বরূপ প্রকটিত করে। এই সকল বিকীর্ণ রশ্মিকে পৃথক্ পৃথক্ ফুটাইয়া একত্র করিতে পারিলেই জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয় ও দিব্যনেত্র উন্মীলিত হয়। ষট্‌চক্রভেদের ইহাই তাৎপর্য্য। আভাস অহং ক্রমশঃ বিশুদ্ধ অহংএ পূর্ণতা লাভ করে। মানবজীবনের সফলতা তাই আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

রশ্মিসকল মানবদেহে তেজঃ ও কায়াগ্নিরূপে জাগ্রৎ হয়। পূর্ণভাবে জাগিলে ইহারাই সম্মিলিতভাবে ঋষিগণের বর্ণিত ব্রহ্ম-বর্চসরূপে উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞানবিৎ যোগিগণ ইহাকে তাড়িত শক্তি বা বিদ্যুৎ নামে অভিহিত করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানবদেহে সকল তত্ত্বই বিদ্যমান আছে। আপাততঃ ৩৬ তত্ত্ব না ধরিয়া প্রচলিত ২৪, ২৫ বা ২৬ তত্ত্বই ধরা যাউক। তবে ইহাদের মধ্যে পার্থিব দেহে পৃথিবী তত্ত্বের প্রাধান্য আছে। বলা বাহুল্য, পঞ্চভূতই স্থূল দেহের উপাদান রূপে বিদ্যমান থাকিলেও পাথিব দেহে পৃথিবীরই প্রাধান্য। পৃথিবীর অংশ অন্যান্য ভূত বা তত্ত্বের অংশের সহিত মিলিতভাবে বিদ্যমান আছে। এই মিলনের বা সংঘাতের মূলে আছে সংস্কারোপহিত শক্তিরূপী চৈতন্যের সংহনন শক্তি। চিৎ ও অচিতের মিলনেই সৃষ্টি—ইহা মনে রাখিতে হইবে। যোগী বা কর্ম্মী যখন আত্মকর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার ক্রিয়মাণ কর্মের প্রভাবে এই সংঘাতটি ভাঙ্গিয়া যায়—অবশ্য

ক্রমশঃ। ফলে চৈতন্যাংশ মুক্ত হয় ও জড়াংশ পৃথক্ হয়। এই পৃথক্‌করণটি বিবেকের ক্রিয়া।

দুগ্ধ বা দধি মন্থন করিলে যেমন মাখন উত্থিত হয়, যেমন গম ভাঙ্গিলে তাহা হইতে আটা বাহির হয়, তিল ও সর্ষপ ঘানিতে পিষিলে যেমন তৈল বাহির হয়, তদ্রূপ কর্মরূপ মন্থন-ক্রিয়ার প্রভাবে পার্থিব দেহ হইতে দেহস্থ চিদুজ্জ্বল সত্ত্বাংশ তাড়িত শক্তি রূপে পৃথক্ হয়। ক্রমশঃ জলীয় ও অন্যান্য ভৌতিক অংশ হইতেও সত্ত্বাংশ পৃথক্ হইয়া যায়। স্থূলদেহের সমস্ত সত্ত্বাংশ যতক্ষণ পৃথক্ না হয় ততক্ষণ মন্থন-ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে। তাহার পরে আর ঐ ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। তিলে যে পরিমাণ তৈল নিহিত থাকে তাহার সবটুকু বাহির হইলে আর পেষণের প্রয়োজন থাকে না, কারণ অবশিষ্টাংশ তৈলহীন অসার পিণ্ড মাত্র। তদ্রূপ স্থূলদেহে যে পরিমাণ চৈতন্য শক্তি আবদ্ধ ছিল তাহার সমস্তটা মুক্ত হইলে স্থূল দেহের ক্রিয়ার অবসান স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অনন্তকাল বিবেক-ক্রিয়া চলে না। বিবেকমূলক জ্ঞানের উদ্ভব হওয়াই কর্মের উদ্দেশ্য।

ঐ উদ্‌ভূত তেজঃ বা শক্তি স্থূল দেহের অন্তঃস্থ অপঞ্চীকৃত ভূত ও অন্যান্য তত্ত্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিগলিত করে ও স্থায়ী আকারে পরিণত করে। সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব—কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব হইতে স্থায়ী আকার গঠন এতদিন হয় নাই। তাই প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ সাধকের ততদিন প্রাপ্তি ঘটে না যতদিন তাহার স্থূল দেহের কর্মের অবসান না হয়। ঐ সকল তত্ত্ব উপাদান হিসাবে প্রতি মানবেই আছে এবং নিজ নিজ কার্য্য

করিতেছে, কিন্তু স্থায়ী দেহ রূপে কার্য্য করে না। দেহরূপে উহারা যখন পরিণত হয় তখন স্থূল শরীরের অভিমানী পুরুষ স্থূলে অভিমান-রহিত হইয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানী হয় ও আপন ইচ্ছানুসারে স্থূল পিণ্ড ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে পারে ও ফিরিতে পারে। যোগী ভিন্ন সাধারণ মানুষ ইহা পারে না। তাহার একমাত্র কারণ, স্থায়ী রচনারূপে সূক্ষ্ম শরীর তাহার নাই ও তাহাতে তাহার অভিমানও ক্রিয়াশীল নহে। প্রকৃতির নিয়মে ও প্রেরণাতে স্বপ্নাদি অবস্থাতে সকলেরই সূক্ষ্ম শরীরের গতি ও সঞ্চরণ দৃষ্ট হয়, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা বাসনাদিবশতঃ প্রকৃতির প্রভাবে হয়, স্বেচ্ছাতে হয় না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা সম্পন্ন হইলে স্বেচ্ছাতে যেমন স্থূল জগতে স্থূলদেহ লইয়া ব্যবহার করা যায়, তদ্রূপ নিজের ইচ্ছা অনুসারে সূক্ষ্ম জগতেও সূক্ষ্মদেহ লইয়া বিচরণ করা যায়।

অনাত্মাতে আত্মবোধরূপ অভিমান যখন স্থূল শরীর অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে তখন এই অভিমান হইতেই স্থূল দেহের কর্ম প্রসূত হয়। কিন্তু যখন পূর্ব্বলিখিত নিয়মে একদিকে স্থূল দেহের কর্ম সমাপ্ত হইবে ও অপরদিকে স্থায়ী সূক্ষ্ম দেহ সূক্ষ্ম সত্তার উপাদানে অভিব্যক্ত হইবে তখন ঐ অভিমান স্বভাবতঃ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিবে। তখন ঐ সূক্ষ্ম দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে হইবে ও স্থূলদেহে 'আমি'-বোধ আভাস মাত্র হইয়া যাইবে। কারণ স্থূলদেহ চৈতন্যের অপগমের ফলে তখন শববৎ হইবে। অভিমানশীল সূক্ষ্মদেহ তখন এই শববৎ স্থূল দেহকে নিজের অধীন করিয়া আসনে পরিণত করিবে।

ইহাই প্রকৃত শবাসন—পূর্ণ যোগীর যোগ-ক্রিয়ার পরিপুষ্টির জন্য এই আসনই উপযোগী হয়। তখন স্থূল-নিরপেক্ষ অথচ শবাসনী-কৃত স্থূলে অধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম দেহে কর্ম আরম্ভ হয়।

যদি প্রারব্ধ ভোগ পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া যায় ও স্থূল দেহের কর্ম-সমাপ্তির পূর্ব্বেই স্থূল দেহের অন্ত ঘটে তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্ম করিবার জন্য মৃত্যুর পর আবার স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, আত্মকর্মই এখানে কর্ম শব্দের লক্ষ্য। আত্মকর্ম না হইয়া অন্য কর্ম হইলে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে যদি কাহারও স্থূল কর্মের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধও সমাপ্ত হয় ও তাহার ফলে স্থূলদেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে শবাসনরূপে পরিণত করিবার ও তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া সূক্ষ্মদেহে কর্ম করিবার সুযোগ এ জীবনে ঘটে না।

স্থূল কর্ম প্রভাবে যেমন স্থূল ভৌতিক সত্তা হইতে চৈতন্যের নিষ্কর্ষ হয় ও সেই চৈতন্য-শক্তিরূপী অগ্নির তাপে সূক্ষ্ম সত্তা বিগলিত হইয়া আকার ধারণ করে ও স্থায়ীরূপে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহে অভিমান উদয়ের পরে সূক্ষ্মদেহে অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সূক্ষ্ম সত্তাতে নিহিত অবিবিক্ত চৈতন্য-শক্তির বিবেচন হয় ও সেই চৈতন্যশক্তি পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে উত্থিত হইয়া কারণ সত্তাকে বিগলিত করে, যাহার ফলে কারণ সত্তা প্রকৃত কারণদেহরূপে পরিণত হয়। যতদিন সূক্ষ্ম সত্তা হইতে তন্নিহিত সমগ্র চৈতন্য বা তেজঃ সমাহৃত না হয় ততদিন সূক্ষ্ম দেহের কর্মের অবসান হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা অনুষ্ঠেয় আত্মকর্ম পরিসমাপ্ত হয় তাহা হইলে সূক্ষ্ম দেহটিও পূর্ব্ববৎ স্থূলের

ন্যায় শবরূপে পরিণত হয় ও অভিমান সূক্ষ্মকে ত্যাগ করিয়া কারণ-দেহকে আশ্রয় করে। 'আমি'টি তখন কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি শবাসনের উপর অধিষ্ঠিত হয় ও কারণ-দেহের কর্ম পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সূক্ষ্মদেহের কর্ম এক আসনের কর্ম, কিন্তু কারণদেহের কর্ম দুই আসনের কর্ম।

কিন্তু যদি সূক্ষ্মের কর্ম পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে কারণ দেহের অনুষ্ঠেয় কর্ম অনারব্ধ থাকিয়া যায়। স্থূল দেহের কর্ম পূর্ণ না হইয়া দেহপাত হইলেও তদ্রূপ সূক্ষ্মের কর্ম অনারব্ধ থাকে। স্থূলাভিমান থাকিতে থাকিতে স্থূলকর্ম বন্ধ হইলে আবার স্থূলকে গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু স্থূলাভিমান নিবৃত্ত হওয়ার পর বা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটিলে সাধারণতঃ মাতৃগর্ভে আসিবার প্রয়োজন হয় না। তখন সূক্ষ্মদেহ শবাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে। তাই ঐ মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে। সূক্ষ্মাভিমানী শবীভূত স্থূলে উপবিষ্ট যোগী তথাকথিত মৃত্যুর পরেও আসন ত্যাগ করে না—সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়া সে কার্য্য করিতেই থাকে। তাহার কর্মে বাধা হয় না। তবে জীবিত অবস্থাতে থাকিয়া কর্ম করিতে পারিলে কর্ম সমাপ্ত হয় অল্প সময়ে—কারণ ঐ কর্ম কালের কর্ম। উহা ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু স্থূল কর্ম সমাপ্ত না করিয়া মৃত্যু ঘটিলে শবাসন লাভ হয় না বলিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অন্য কোন উপায় নাই। অন্ততঃ একটি শবাসন লাভ করিতে পারিলেও যোগী আসনে **বসিতে** পারে বলিয়া গর্ভযন্ত্রণা ও কালরাজ্যে প্রবেশের উপদ্রব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। মৃত্যুর

ভিতর দিয়াই অমরত্বের মার্গ রহিয়াছে জানিতে হইবে। পশুর মৃত্যুতে অমরত্ব আসে না—পশু "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি," পুনঃ পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা ভোগ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। কিন্তু স্থূলদেহের আবশ্যকীয় কর্ম পূর্ণ করিতে পারিলে ও স্থূলদেহকে শবরূপে আসন করিয়া নিজে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে জন্ম-মৃত্যু বর্জিত হইয়া যায়। কিন্তু কর্মের পূর্ণতা হয় নাই বলিয়া কর্ম বর্জিত হয় না, মহাজ্ঞানও আসে না। আপেক্ষিক খণ্ড জ্ঞান অবশ্য আসে।

প্রশ্ন হইতে পারে—যোগী তখন কোথায় ও কি ভাবে থাকিয়া কর্মের ক্রমিক বিকাশ সম্পন্ন করেন? এই প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করিতে চেষ্টা করিব ইচ্ছা রহিল। তবে এই স্থানে ইহাই বলিয়া রাখি যে আত্মকর্মের গতিরোধ হয় না ও একবার শবাসন প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, কালের অতীত, নির্মল ভূমিতে যোগী আত্মকর্ম পূর্ণ করিতে থাকেন। তবে ঐ কর্ম পূর্ণ করিতে সময় অধিক লাগে। কালের রাজ্যে বিকাশ যত দ্রুত হয় অমর দেহে তত দ্রুত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য বর্ত্তমান জীবনে কর্ম সমাপ্ত করা ও অভিনব অনন্ত কর্মের ধারাতে প্রবেশ করা। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতি-জন্য কারণদেহ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই মহালক্ষ্যে উপনীত হইবার আশা নাই। অভিমান কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া কারণদেহে কর্মের সূচনা করে। সূক্ষ্মের কর্ম শেষ হওয়ার পর ও সূক্ষ্মদেহ শবাসন হইয়া কারণে অধিষ্ঠিত হওয়ার

পর যোগী কারণদেহকেই আশ্রয় করিয়া **আমি** বলিয়া নিজেকে অনুভব করেন। আত্মকর্ম চলিতেই থাকে এবং কারণ সত্তা বা মূল প্রকৃতিতে নিহিত গুপ্ত চৈতন্য বিবিক্ত হইতে থাকে। যখন প্রকৃতি-রূপা কারণ সত্তা হইতে চিৎশক্তি বিবিক্ত হয় তখন যোগীকে একটি অনির্বচনীয় স্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অবস্থাতেই জীবাত্মা বা পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান জাগে। পুরুষ যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত তাহা তখন স্বচক্ষে দর্শন হয়। এই সময় যদি পরমেশ্বরের মহাকৃপা লাভ না ঘটে তাহা হইলে পুরুষ এই স্বরূপ-জ্ঞানে প্রকাশমান নিজ সত্তাতে স্থিত হয় ও কৈবল্য লাভ করে। মায়াতেও প্রায় এই জাতীয় অবস্থারই উদয় হয়। দুই আসনের ক্রিয়ার ফলে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধি ঘটে।

কিন্তু ইহাকে আমি মহাসিদ্ধি বলি না—যদিও ইহাও কম নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইলেই ত চলিবে না—প্রকৃতিকেও, ঠিক প্রকৃতিকে নহে কিন্তু কারণ দেহকেও, আসন করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে প্রকৃতি-মুক্ত পুরুষের কৈবল্যই প্রাপ্তি।

কারণদেহকে আসন করিতে হইলে অভিমানকে বিসর্জ্জন না করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে অভিমানের পূর্ণাহুতির সময় আসিয়াছে,—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তিন দেহ রচিত হইয়াছে, তিন দেহেই অভিমান সমভাবে কার্য্য করিয়াছে, ফলে তিন দেহেরই কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে। তাই প্রকৃতির কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিত বদ্ধ চিৎসত্তা মুক্ত হইয়া স্বয়ং পুরুষরূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সুতরাং কর্ম্মের ফলে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে। এখন কৈবল্য স্বতঃপ্রাপ্ত—আর তাহাতে অভিমানের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। কারণ, করণীয় কর্মও আর অবশিষ্ট নাই। তাই ইহাই অভিমানের পূর্ণাহুতির সময়।

কিন্তু মহাযোগী এখানেও শেষ দেখেন না। পূর্ণাহুতি অভিমানের হয় বটে, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। অথবা নির্ব্বাণের মধ্যেও অনির্ব্বাণ অগ্নি জাগাইয়া রাখা হয়—তদ্রূপ অভিমান সমাপ্ত হইলেও একটি বিশুদ্ধ অভিমানরূপে তাহাকে রাখা হয়। কারণ, মহাকর্ম ত বাকী আছে।

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী নির্মল সত্তাতে ঐ অভিমানের যোগ হয়। বলা বাহুল্য, পুরুষ এখন পরমপুরুষ বা মহাপুরুষপদে অভিষিক্ত। প্রকৃতির কর্ম শেষ করিয়া তিনটি শবাসনের উপরে আসীন হইয়া যোগী বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়াছেন। ঐ আধারটি তখন মহাকারণদেহরূপী জানিতে হইবে। এইটি যোগীর বিশুদ্ধ অভিমান বা আমিত্ব। এই আসনে আসীন হইয়াই যোগী বিশ্বকর্মের মহাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন।

তখন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকে না—সমস্ত জীব জগতের প্রয়োজনই তখন তাঁহার প্রয়োজন। ভগবান্ ব্যাসদেব যোগসূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্”। তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন ভূতানুগ্রহ—জীবের কল্যাণ সাধন,—অন্য কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। যোগীও তখন বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়া ভূতানুগ্রহ বা জীবসেবাতে নিরত হন। ইহাই পরার্থ কর্ম।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্"—ইহা সেই জাতীয় কর্ম।

এইখানে একটি গভীর রহস্যের কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যদি এই ভূমি পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে, অর্থাৎ তিন আসনের কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে অথবা প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে চৈতন্য সত্তাকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতিকে ও মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ অভিমান সহকারে মহামায়ার মুক্তক্ষেত্রে আধিকারিক পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাব বিশ্বসংসার অনুভব করিয়া ধন্য হয়। তাহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহ তখন এক হয়—উহাই মহাসিদ্ধদেহ নামে পরিচিত হয়।

প্রকৃতির বিজ্ঞানশালাতে এই বিরাট্ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। বাহ্য জগৎ তাহার কোনও সন্ধান রাখে না, রাখিতে পারেও না।

আমরা যাহাকে মৃত্যু বলিয়া থাকি তাহা অনেক নীচের ব্যাপার। কিন্তু নীচের হইলেও তাহা অপরিহার্য্য। স্থূলদেহ হইতে মানবের সূক্ষ্ম সত্তা পৃথক্ হইলেই আমরা তাহাকে মৃত্যু বলিয়া বর্ণনা করি। কিন্তু যদি স্থূলের কর্ম অর্থাৎ স্থূল যোগ্য আত্মকর্ম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে তাহা হইলে জীবকে অবশিষ্ট আত্মকর্ম করিবার জন্য পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয় বা জন্ম নিতে হয়। যতদিন আত্মকর্ম পূর্ণ না হইবে ততদিন এইরূপই চলিবে। কারণ স্থূল মানব দেহ ধারণ ব্যতীত আত্মকর্ম করার উপায় নাই। অজ্ঞানজ কর্মের ফলে যদি শুদ্ধ বা মলিন ভোগদেহের

প্রাপ্তি ঘটে তবে উহা কালক্ষেপ জানিতে হইবে। কারণ মানবদেহ হইতে একবার চ্যুত হওয়াও অত্যন্ত দুর্ভাগ্য—যে হেতু উহা ক্রম-বিকাশের পথে মহা অন্তরায়। মানবদেহে শুধু প্রারব্ধ ভোগ না হইয়া যদি অজ্ঞানবশে নবীন কর্ম উদ্ভূত হয় তাহা হইলেও উহা সঞ্চিত কর্মের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় এবং উহা নিয়ত-বিপাক হইলে ও ভাবী প্রারব্ধের রচনাতে অঙ্গীভূত হইলে বিপচ্যমান হইয়া অনু-রূপ সুখ-দুঃখরূপ ভোগ দানের জন্য ব্যাপৃত হয়। ইহা কর্ম-জগতের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহার আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

যদি স্থূলের আত্মকর্ম পূর্ণ হয়, কিন্তু তৎক্ষণেই প্রারব্ধ ভোগও পূর্ণ হয় বলিয়া মৃত্যু ঘটে এবং ঐ অবস্থাতে স্থূল দেহকে শবাসন করিবার অবসর না পাওয়া যায় তাহা হইলে খাঁটি সূক্ষ্ম শরীর রচিত হইয়াছে (স্থূলের আত্মকর্ম দ্বারা) বলিয়া মানুষ ভৌতিক সত্তার ঊর্দ্ধে কৈবল্য লাভ করে। তাহাকে আর ভৌতিক জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু তখন এই অসুবিধা থাকে যে আসন প্রাপ্তির অভাবে পরলোকে নিরালম্ব অবস্থা হয় বলিয়া নিষ্ক্রিয় ভাব থাকে—সূক্ষ্মদেহোপযোগী আত্মকর্মের সূত্রপাত হয় না। কৈবল্য হইলেও ইহা ঠিক কৈবল্য নহে, কারণ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ বিদ্যমান থাকে—শুধু কর্ম করিতে পারে না মাত্র। সে স্থূল জগতে আসে না—তাই সে এক হিসাবে মৃত্যু-বর্জিত। কিন্তু তাহারও ভাবী মৃত্যু আছে। কারণ সূক্ষ্মদেহ যখন আছে তখন তাহার কর্মও কখন না কখন করিতেই হইবে এবং পরে তাহারও বর্জন হইবে (যদি দ্বিতীয় শবাসন করিতে না পারা যায়)। সূক্ষ্মদেহের মৃত্যুও মৃত্যু বটে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্থূলের আত্মকর্ম সমাপ্ত ও প্রারব্ধভোগ সমাপ্ত হওয়ার পর অভিমান সূক্ষ্মে যোজিত হইয়া স্থূলকে শবরূপী আসনে পরিণত করিতে পারিলে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিরালম্ব অবস্থার নিষ্ক্রিয়ত্ব ঘটে না। কারণ তখন আসন লাভ হইয়াছে ও কর্ম আরব্ধ হইয়াছে। ইহারই জন্য অমল ভূমির দ্বার মুক্ত হয়—সেখানে কর্ম্মের ক্রমোন্নতি ঘটে। তবে তাহা দীর্ঘকালের ব্যাপার। কারণ কালের প্রভাবের বাহিরে অমর জগতে কর্ম ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয় না।

স্থূল শরীর সাধারণতঃ প্রারব্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রারব্ধ অতি জটিল তত্ত্ব—বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অবসর নিবার ইচ্ছা আছে। কর্ম, অনুগ্রহ, সংস্কার (প্রাক্তন) প্রভৃতি বহু বিভিন্ন শক্তির একত্র সংঘটনে প্রারব্ধ রচিত হয় এবং ইচ্ছার উৎকটতা হইতে উহার সৃষ্টি হয়। তাই এক দৃষ্টিতে আয়ু নিয়ত বলিয়া অকাল মৃত্যু নাই—ইহা সত্য। আবার আয়ুর বৃদ্ধি-হ্রাস উভয়ই সম্ভবপর—ইহাও সত্য। এই বৃদ্ধি-হ্রাস শক্তির সংযমের বা অপচয়ের ফলে হইতে পারে—অথবা বাহির হইতে শক্তির অনুপ্রবেশাদি কারণ হইতেও হইতে পারে।

যে কোন কারণেই হউক এই দেহটি বজায় থাকিতে থাকিতেই যোগী নিজের সমস্ত আত্মকর্ম সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন। এই দেহে থাকিতেই যদি ভৌতিক দেহকে শব করিয়া নিজে সূক্ষ্ম শরীরে—তাহা আভাসময় ভাবদেহই হোক বা জ্ঞানদেহই হোক—অভিমান করিয়া সূক্ষ্মের আত্মকর্ম করা যায় তাহা হইলে এই দেহে থাকিয়াও অমল ভূমিতে অবস্থান করা যায়। তবে নিম্নস্তরে।

জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে নিজের অনুভব ও বোধ অনুসারে অমল ভূমির রহস্যের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিব। গুপ্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন ব্যক্ত জগতে অসম্ভব। তবে অধিকারিগণের কৃপা হইলে কাহারও কাহারও ভিতরে মহালোকের ক্রিয়াতে কিছু কিছু প্রকাশের খেলাও ঘটিতে পারে।

লৌকিক-অলৌকিক

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব, ডি, এস-সি

(১)

বর্ত্তমান বৎসর (সন ১৩৬০) এক হিসাবে খুব সুবৎসর। আমার গণনা অনুসারে এই বৎসরেই শ্রীশ্রীবাবার এক শত বর্ষ পূর্ণ হইল। আমার মতে তাঁহার জন্ম সন ১২৬০, ২৯শে ফাল্গুন। এই বৎসরটি তাঁহার জন্ম বৎসর ধরিলে অনেক কিছুই বেশ ভাল ভাবে মিলিয়া যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয় দাদা তাঁহার বহিতে যে জন্ম বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—অর্থাৎ ১২৬২ সাল—তাহা একাধিক কারণে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। শ্রীশ্রীবাবার জন্ম বৎসর কি তাহা নির্দ্ধারণ করা খুব কঠিন নয়। ঐ বৎসর কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার পিতৃদেব পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজে কাজেই একটু চেষ্টা করিলে ঐ বৎসরটির সঠিক উদ্ধার হইতে পারিবে।

আর একটি তারিখ সম্বন্ধে এইখানে একটু আলোচনা করিতেছি। তাহা হইল গুঙ্করায় তাঁহার আগমনের সময়। পরলোকগত যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আমার কিছু আলোচনা হইয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া এই আলোচনাটির সারাংশ এখানে দিতেছি। শ্রীশ্রীবাবা যেদিন প্রথমে গুঙ্করায় আসেন—সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার দেখা হয় যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়ের সঙ্গে। ষ্টেশন হইতে নামিয়া তিনি

চোঙ্গদারদের বাটীতে যাইতেছিলেন। পথে একটি শিশু বালককে দেখিয়া ঐ বাটী কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই শিশুটিই হইলেন যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার। যজ্ঞেশ্বর তাঁহাকে পথ দেখাইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তখন আপনার বয়স কত ছিল। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—দশ বৎসর। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের জন্ম হইয়াছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (এইটি অসমর্থিত)। কাজে কাজেই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীবাবা গুষ্করায় আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের নিকট অনেকগুলি কথার মধ্যে এই একটি কথা শুনিয়াছিলাম যে শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ হইয়াছিল তাঁহার গুষ্করা থাকা কালে। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয় নাকি বরযাত্রী হইয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন।

গুষ্করায় আসিবার বোধ হয় বছর দুই আগে শ্রীশ্রীবাবা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার বয়স বোধ হয় ৩৫ বছর ছিল। এইটি শ্রীযুক্ত অক্ষয় দাদা মোটামুটি ঠিক ধরিয়াছেন। গুষ্করায় শ্রীশ্রীবাবা বিশ বছর বাস করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে যদি গুষ্করা ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার গুষ্করার আগমন ১৮৯০ সালেই হওয়া উচিত।

এই বৎসর তাই এক হিসাবে আমাদের পক্ষে খুব সুবৎসর। শ্রীশ্রীবাবা এই মর্ত্ত্যধামে আসিবার পর এই বৎসর এক শতাব্দী পূর্ণ হইল। এই বৎসর একটি ভাল করিয়া উৎসব করিলে খুব ভাল হইত। আমরা উৎসব না করিলেও উৎসব যে হইবে না তাহা নহে—খুব ভাল করিয়াই হইবে। কোন কোন ভাগ্যবান্ তাহা দেখিবার সৌভাগ্যও লাভ করিবেন বলিয়া মনে করি।

(২)

শ্রীশ্রীবাবার জীবনটি ছিল লৌকিক ও অলৌকিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অতি শিশু অবস্থা হইতেই অলৌকিক ব্যাপার তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ঘটিতে দেখা গিয়াছে। কোনও কোনও ঘটনা এত অদ্ভুত রকম অলৌকিক যে আশ্চর্য্য হইতে হয়—অবিশ্বাস হয় যে তাহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহাকে নূতন কাপড় দেওয়া হইল। তিনি শিশু-সুলভ চাপল্য বশতঃ তাহাকে ফালি ফালি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর যখন তাড়িত হইলেন তখন সে বস্ত্রখণ্ডগুলিকে একমুঠা করিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন। দেখা গেল যে কাপড়টা যেমন আস্ত ছিল তেমনিই আবার আস্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ঘটনা তাঁহার শিশু অবস্থা হইতেই সংঘটিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যেন তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার মত ছিল। ইহার জন্য তাঁহাকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। সাধনা করিয়া ইহাকে লাভ করিবার চেষ্টা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। বরং হয়ত পরবর্ত্তিকালে চেষ্টা করিয়া ইহার প্রকাশ নিরুদ্ধ করিতেই হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাঁহার প্রতি কাজেই অলৌকিক এত বেশী পরিমাণ আবির্ভূত হইত যে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইত। খুব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি বোকার মত আচরণ করিতে চেষ্টা করে তবে সেই বোকামীও ঠিক বোকামী হয় না—অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দেয়। ইহাও যেন কতকটা সেইরূপ। লৌকিক ও অলৌকিকে এইরূপ সংমিশ্রণ অন্য কাহারও জীবনে এত সহজভাবে মিশিয়া যাইতে বড় একটা দেখা যায় না।

(৩)

এই লৌকিক ও অলৌকিক এর ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত জীবনটির মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান পরিবর্ত্তন দেখা যায় তা আপাতদৃষ্টিতে একটি অতিশয় অশুভ লৌকিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই ঘটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবনটির মধ্যে সত্যকারের conscious আধ্যাত্মিক চেতনার আরম্ভ হয় এক ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ভিতর দিয়া। যে সালে তিনি দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করেন ক্ষেপা কুকুর তাঁহাকে সেই বৎসরই দংশন করে। ১২৭১ সালে রচিত—গীত-রত্নাবলীতে সংগৃহীত—প্রথম গানটিতে এই আধ্যাত্মিক সূচনার ইঙ্গিত স্পষ্ট রহিয়াছে। এই গানগুলি কুকুরে কামড়াইবার পর রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ নীমানন্দ পরমহংস তাঁহাকে আরোগ্য করিবার অছিলায় একটি মন্ত্র দিয়া যান। তাহা এই কুকুরে কামড়াইবার দুর্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে এইভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের বাহ্যিক সূত্রপাত হইয়া তীর্থস্বামিত্ব লাভ করেন সম্ভবতঃ ৩৮ বৎসর বয়সে—তাহার ২৫।২৬ বৎসর পরে। তখন তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দারপরিগ্রহের পরীক্ষায় সফল হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর জীবনের বড় ট্রাজেডী সংসারকে স্বীকার করা—তাঁহাকে তাহা করান হইয়াছে। বিবাহের পরই আবার তাঁহাকে একটি জাতসাপ দংশন করে। (পরে ইহা বিস্তারিতভাবে বলিতেছি।) অন্য কেহ হইলে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখনও তিনি পরমহংস হন নাই। তিনি পরমহংস পদ প্রাপ্ত হন ১৯১০

সালে অর্থাৎ তাঁহার ৫৬ বৎসর বয়সে ও পরমপূজ্যপাদ মহাতপা মহারাজের তাঁহাকে দীক্ষাদানের প্রায় ৪২ বৎসর পরে। এই সময় তাঁহার ২০ বৎসরের কর্ম্মস্থল গুষ্করা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এখনও অধ্যাত্ম-জীবনের সাধনার কিছু বাকী ছিল। ১৯১৪ সালে * পূজ্যপাদ অভয়ানন্দ তাঁহাকে চিঠিতে জানাইয়াছিলেন যে তখনও আরও চারি বৎসর রহিয়াছে তাঁহার ক্রিয়া পূর্ণ হইতে। ১৯১৯ সালে দেখিতে পাই তাঁহার লৌকিক জীবনের কি প্রচণ্ড তুর্বৎসর! ঐ বৎসর তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর দেহান্ত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারে যেন মড়ক আসিয়া লাগে। ইচ্ছা করিলেই ইহার প্রতিকার করা তাঁহার করায়ত্ত ছিল। কিন্তু প্রতিকার করার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। যাহা ঘটিবার ঘটিল। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল প্রতিকারের বিষয়, কিন্তু তাহা তিনি কানেও স্থান দিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। শেষ সমাপ্তির পরীক্ষায় তাঁহার অটল দৃঢ়তা অতিশয় লৌকিকভাবে হইলেও সেইরূপই অলৌকিকত্বের সূচনা করে। তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তির ৫১ বৎসরে তাঁহার "ক্রিয়ার" সমাপ্তি হইল। শ্রীশ্রীবাবার জীবনে তাই ১২ বৎসর, ৩৮ বৎসর, ৪২ বৎসর ও ৫১ বৎসর লৌকিক দৃষ্টিতে যেমন অশুভ, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তেমনই শুভ।

---

* শ্রীমৎ অভয়ানন্দ পরমহংস দেবের মূল পত্রখানা আমার নিকট আছে। ইহাতে কোন সন তারিখের উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা যে ১৯১৪ সালে লিখিত তাহা বলা চলে না। আমার মতে এই পত্রখানা ১৯০৬ সালে লিখিত। যে ৪ বৎসরের কথা উহাতে বলা হইয়াছে তাহা শ্রীগুরুদেবের পরমহংসপদপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিয়া মনে হয়। —সম্পাদক

তাঁহার জন্ম-কুণ্ডলী আমি দেখি নাই। ছিল বলিয়া জানি, কারণ বাল্যকালেই তাঁহার জন্ম-কুণ্ডলী বিচারে জানা গিয়াছিল যে তাহাতে তাঁহার পরমায়ু মাত্র ২২ বৎসর রহিয়াছে। এই কুণ্ডলীতে এই বৎসর গুলির সময় কোন্ কোন্ গ্রহের অশুভ প্রভাব ছিল তাহার বিচার করা একটি ভাল অবসর-বিনোদনের ব্যাপার হইবে সন্দেহ নাই।

এইখানে আমাদের জন্য অনেকগুলি ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীশ্রীবাবার জীবনটি আমাদের কি পরিমাণে শিক্ষণীয় বিষয় তাহা আমরা অল্পই অনুধাবন করি। জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণের চিঠিতে তাঁহার অতিশয় উগ্র সাধনার কথা বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই উগ্র সাধনা করিয়াও ৫০ বৎসরেরও অধিক লাগিয়াছিল তাঁহার "ক্রিয়ার" সমাপ্তিতে। তাহা ছাড়া কোথাও তাঁহাকে উতলা হইতে দেখা যায় নাই। বরং সব সময়েই তিনি অত্যন্ত নির্ভরতার ভাব লইয়া, যেন আত্ম-সমাহিত হইয়াই, থাকিতেন। শ্রীশ্রীবাবা যখনই কাহাকেও কোনও চিঠি দিতেন একটি কথা সেখানে প্রায়ই থাকিত—"কোনও বিষয়ে কিছু চিন্তা করিবে না। যে ক্রিয়া দিয়াছি সাধ্য মত তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। সময়ে আপনিই সব ঠিক হইয়া যাইবে।" এই উপদেশটি তিনি তাঁহার নিজ জীবনে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াই এমন অক্লান্তভাবে বিতরণ করিতেন বলিয়া মনে করি।

(৪)

শ্রীশ্রীবাবার বয়স তখন ছয়, সাত কি আট বৎসর হইবে। জ্ঞানগঞ্জের ও মনোহর তীর্থের পরমহংসগণের দৃষ্টি তখনই তাঁহার

উপর পতিত হইয়াছিল। তাঁহাকে "অপহরণ" করিবার ফন্দি বোধ হয় তখন হইতেই তাঁহারা আটিতেছিলেন। পরমপূজ্যপাদ জ্যাঠাগুরুদেব শ্রীমৎ অভয়ানন্দজী বণ্ডুলের শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া আসন লইয়া বসিলেন। ভাবটি কিন্তু ধরিলেন অতিশয় উগ্র। যে কেহ নিকটে যাইত তাহার প্রতি ক্ষেপিয়া হুলস্থুল বাধাইতেন। তাঁহার ক্ষিপ্ত ভাব নিকটস্থ শিশু ও বালকদের কৌতূহলের কারণ হইল, কিন্তু ক্ষেপা সন্ন্যাসীটি যেন বালকদের প্রতি আরও বেশী উগ্রভাব ধারণ করিলেন। তাই কাহারও তাঁহার কাছে ঘেসিবার সাহস হইল না।

প্রায় তুই মাইল দূরে বণ্ডুলে বালক মহলে রটিয়া গেল যে শ্মশানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে—সে অতিশয় ভীষণ আর তাহার কাছে কেহ যাইতে সাহস পায় না, সে মারিতে দৌড়ায় ও ভীষণ গালাগালি দেয়। ইহা শুনিয়াই বালকদলের একটি বলিয়া উঠিল "আমি যাইব।" সঙ্গীদল তাহাকে বার বার নিষেধ করিল, কিন্তু এই বালকটি তাহার সঙ্কল্প ছাড়িতে রাজী হইল না। তবে বলিল যে তাদের মধ্যে কেউ যদি সাহস ক'রে তার সঙ্গে যাইতে পারে ত যাবে। শেষ পর্য্যন্ত তুইজন অপর বালকও এই বালকটির সঙ্গে যাইতে রাজী হইল। ঠিক হইল যে তুই তিন দিন পরে তাহারা যাইবে এবং রাত্রিকালে যাইবে।

যাওয়া স্থির করিয়া বালকটি এক আনা খরচ করিয়া একটি বড় কাঁঠাল সংগ্রহ করিল। শ্রীশ্রীবাবা গল্প করিতে করিতে কাঁঠালটিরও বর্ণনা দিয়াছেন। সেটি ছিল একটি খুব বড় কাঁঠাল এবং সুপক্ক। একজন লোকের পক্ষে সেটিকে তুলিতে পারা শক্ত

ছিল। শ্রীশ্রীবাবা অত অল্প বয়সেও অতিশয় শক্তিশালী ছিলেন এবং এই অর্দ্ধমন ওজনের কাঁঠাল অবলীলাক্রমে বহন করিবার সামর্থ্য রাখিতেন। এই কাঁঠালটি কিনিয়া তিনি তাঁহাদের গোয়াল ঘরের চালায় সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিলেন। পাকা কাঁঠালের সময় ছিল বলিয়া সে সময়টা বোধ হয় গ্রীষ্মকাল ছিল বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, যাওয়ার সব ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গী দুইটির সঙ্গে যাওয়ার সময় ঠিক করিয়া শ্মশানে সন্ন্যাসী দর্শনের জন্য সময়ের বা রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সে দিন আবার শ্রীশ্রীবাবার মাতাঠাকুরাণী যেন ঘুমাইতেই চাহেন না। শ্রীশ্রীবাবা বিছানায় শয়ান—চক্ষে ঘুম নাই। মাতা-ঠাকুরাণী নানান্ কাজে বিছানায় শুইতে আসিতেছেন না। বাবা মাঝে মাঝে ডাকিতেছেন—"মা এস—না এলে আমি ঘুমাইব না।" মা আর যেন আসেন না। অবশেষে যখন মা আসিলেন—তিনি ঘুমাইতেও যেন চান না। শ্রীশ্রীবাবার পরিচর্য্যা করিতেই সময় কাটিতেছে। এদিকে শ্রীশ্রীবাবা মনে করিতেছেন—কতক্ষণে মা শুইবেন ও ঘুমে জড়াইয়া পড়িবেন। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত মা'ত ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার দুর্দ্দান্ত সন্তানটি সন্তর্পণে উঠিয়া গোয়াল ঘরের দিকে চলিলেন। অন্ধকারেই চালা হইতে প্রকাণ্ড কাঁঠালটি নামাইলেন ও সঙ্গী দুইটির জন্য পথে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহাদের কেহই আর আসিল না। তখন শ্রীশ্রীবাবা একাকীই রওয়ানা হইলেন।

প্রায় দুই মাইল গ্রাম্য বন্ধুর পথ একাকী পদব্রজে অতিক্রান্ত করিবার পর বগুলের শ্মশানভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। আর দৃষ্টি-

গোচর হইল একটি জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড। তিনি দূর হইতে লক্ষ্য করিলেন যে একটি গাছের নীচে যেন একটা প্রকাণ্ড আগুন জ্বলিতেছে। যে বালক গভীর রাত্রিকালে এইভাবে শ্মশানে একাকী আসিতে সাহস পায় এই আগুন দেখিয়া তাহার কি ভয় হইবে? সাধারণতঃ একলক্ষ বালকের মধ্যে একটিও হয় ত এইভাবে শ্মশানে আসিতে গেলে রাস্তার মধ্যেই ভয় পাইয়া না পলাইয়া থাকিতে পারিবে না। তিনি আরও নিকটবর্ত্তী হইতে গেলে দেখিলেন যে সে আগুনটি প্রকৃত আগুন নহে, একটি মানুষের গা হইতে তাহা বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়াই তিনি স্থির করিলেন যে ইনিই বোধ করি সেই সন্ন্যাসী হইবেন। তিনি আরও আগাইয়া গেলেন।

এদিকে সন্ন্যাসীটি এই ছেলেটিকে আসিতে দেখিয়া নিজ রুদ্র মূর্ত্তি ধরিলেন। উচ্চ স্বর ও বড় বড় দুইটি পাথর লইয়া তাঁহার দিকে তাড়া করিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তখন তাড়াতাড়ি কাঁঠালটি মাটিতে রাখিয়া একটি বড় বাঁশ এদিক্ ওদিক্ হইতে সংগ্রহ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে এ যদি আমাকে মারিতে আসে তবে এই বাঁশ দিয়া তাহা আমি নিরুদ্ধ করিব। উচ্চৈঃস্বরে সন্ন্যাসীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কেন এইরূপ খারাপ ব্যবহার করিতেছ?" সন্ন্যাসীটি ছেলেটির এইরূপ বাঁশ লইয়া রুখিয়া উঠিতে দেখিয়া যেন একটু শান্ত ভাব লইল এবং বাবাকে বাঁশটি ফেলিয়া দিতে বলিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—"তা' হলে তুমি তোমার হাতের পাথরগুলি ফেলিয়া দাও।" সন্ন্যাসীটি বাবার কথা শুনিল, ও বলিল, "তবে

তুমিও বাঁশটি ফেল।" এই বলিয়া সে পাথরটি দূরে নিক্ষেপ করিল। বাবাও বাঁশটি ফেলিয়া দিলেন, কিন্তু দূরে ফেলিলেন না, নিকটেই রাখিলেন—কি জানি বাপু যদি ও আবার তেড়ে আসে। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে সন্ন্যাসীটি বোকার মত কাজ করিল। যাহা হউক, এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইবার পর তিনি তাঁহার আনীত কাঁঠালটি উপহার দিতে চাহিলে সন্ন্যাসীটি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিল এবং সেইখানে বসিয়াই সেই প্রকাণ্ড কাঁঠালটি দুই হাত দিয়া চিরিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে সবটা খাইয়া ফেলিল।

খাওয়া শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছেলেদের প্রতি তিনি এত খারাপ আচরণ করেন কেন। উত্তরে সন্ন্যাসীটি বলিলেন যে ছেলেগুলি অতিশয় বদ। তবে তিনি ইহাদের মত নহেন, তাই শুধু তাঁহাকেই নিকটে আসিতে দিয়াছেন। সন্ন্যাসী তখন অনেক শান্ত মূর্ত্তি লইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে অনেক রকম ছেলেমানুষী বাক্যালাপও করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বাবাকে নিতে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন, "পরে আবার দেখা হইবে।" ইতিমধ্যে ঘুমন্ত মা জাগিয়া উঠিয়া শয্যায় ছেলেকে না দেখিতে পাইলে কি রকম হুলুস্থুলু বাধাইবেন মনে হওয়াতে শ্রীশ্রীবাবা ফিরিতে চাহিলেন—তখন দেখিলেন যে রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রায় রাত্রি তিনটায় তিনি তাঁহার পরবর্ত্তিকালের গুরুভ্রাতা স্বামী অভয়ানন্দজীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে ফিরিয়া অত্যন্ত স্বস্তির সহিত দেখিলেন যে তাঁহার মা তখনও তেমনই অঘোরে ঘুমাইতেছেন। তাঁহার রাত্রিকালের দুর্দ্দান্ত অভিযানের কোনও খবরই তাঁহার নাই।

চৌদ্দ বছর বয়সে জ্ঞানগঞ্জে যখন তিনি যান তখন এই সন্ন্যাসীটিকে সেখানে সন্ন্যাসী-সংঘট্টের মধ্যে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন। "আর সেও আমাকে দেখিয়া সেই শ্মশানের রাত্রির ঝগড়া ও মারামারির কথা মনে করিয়া বোধ হয় হাসিতেছিল।"

(৫)

এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি আছে যে ঠিকুজীর হিসাবে শ্রীশ্রীবাবার আয়ু ২২ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার ১২ বৎসর বয়সে যে একটা বড় ফাঁড়া ছিল তা দেখিতে পাই। সেই সময়ে তাঁহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরে কামড়াইয়া ছিল। প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তর ক্ষেপা কুকুর বা শৃগাল কামড়াইলে তাহার চিকিৎসার সূত্রটি আবিষ্কার করেন নাই। সে সময় গোঁদলপাড়াই (চন্দননগর) ছিল এইরূপ চিকিৎসার কেন্দ্র। কিন্তু ক্ষেপা শৃগাল বা কুকুরে কামড়াইলে তখন অতি সামান্য শতকরাই পরিত্রাণ পাইত—নির্ঘাৎ তাহাদের জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। শ্রীশ্রীবাবার সম্ভবতঃ জলাতঙ্কের লক্ষণ কখনও হয় নাই। তবে দংশন অতি তীব্র ছিল এবং তাহাতে যথেষ্ট কষ্টও পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। ঠিক ইহারই পরবর্ত্তী কালে লিখিত তাঁহার গান-গুলিতে তাঁহার এই সময়ের জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মীয়-স্বজন সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে ভয় করিতেছিল যে কখন তাঁহার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়—কিন্তু

শ্রীশ্রীবাবা তাহার জবাবে লিখিয়াছেন—"ভোলানাথ বলে—কচু হবে। বাঁচব শ্যামা মায়ের জোরে।" ঠিকুজীর ২২ বৎসরে বোধ হয় কোনও ঘটনা ঘটে নাই—ঘটিয়া থাকিলে তাহা অবশ্য প্রকাশ থাকিত।

২২ বৎসরে না ঘটিলেও তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহাকে আবার এক অতি ভয়াবহ দংশনের কবলে পড়িতে হইয়াছিল। এ গল্পটি শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসে। বৈশাখ মাসে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনিতে মন্তেশ্বরে তাঁহার শ্বশুর আলয়ে যান। তাঁহার বিবাহের সময়ই তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা বেশ ছড়াইয়াছিল এবং বিবাহের বাসরে তিনি কিছু কিছু শক্তির ক্রীড়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার নূতন আত্মীয়দের ও এই বিচিত্র উৎসবটির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পুরাকালের শিবের বিবাহের একটি নূতন সংস্করণ যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনও স্মৃতি থাকিলে তাহা গল্পাকারে প্রকাশ করিলে অনেকের আনন্দের বিষয় হইবে।

এইবার বর্ণনীয় বিষয়টির অবতারণা করি। গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ঘটনা হিসাবে ইহার মূল্য রহিয়াছে। বোধ হয় ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও তাহা হইলে তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়সেই ঘটিয়াছিল ধরিয়া লইতে হয়। মন্তেশ্বরে শ্বশুরালয়ে গিয়াও তাঁহার নিত্য-স্নান বাদ যাইত না। প্রতিদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার এক সম্পর্কিত শ্যালককে লইয়া নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে স্নানে যাইতেন। পুষ্করিণীটিতে ঝাঁঝি ও পানায় ভর্ত্তি ছিল। একদিন স্নানে নামিয়াই জলে থাকা কালীন

শ্রীশ্রীবাবা বুকে দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। দংশনের সঙ্গে সঙ্গে কি বস্তুতে তাঁহাকে কামড়াইল তাহাও বুঝিতে পারিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার বুকের ক্ষত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাকে এই ভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার শ্যালকও উঠিয়া আসিলেন ও ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহাকে জাত সাপে কামড়াইয়াছে। কিন্তু এ কথা বাহিরে যেন প্রকাশ না করা হয়। তিনি তাঁহার শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওখানে নিকটে কোনও প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির আছে কিনা। তাঁহার শ্যালক তাঁহাকে বলিলেন যে প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির পুষ্করিণীটির অতি নিকটেই আছে এবং সেখানে নিত্য পূজাও হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবাবা তাড়াতাড়ি মন্দিরটির দিকে চলিলেন ও মন্দির সমীপে পৌঁছিয়াই তাঁহার শ্যালককে বলিলেন, "আমি এই মন্দিরে ক্রিয়া করিতে ঢুকিলাম। এর দরজা যেন আমার বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ খুলিতে চেষ্টা না করে।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে যাইয়া মন্দিরের অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার শ্যালকটি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাবার যোগক্রিয়ার প্রসিদ্ধিও জানিতেন। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই তাঁহার বিবাহের রাত্রেই তাঁহার অলৌকিক যোগ-বিভূতির পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই সব কারণে তিনি শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন সেইরূপ করিতেই মনঃস্থ করিলেন। বাড়ী আসিয়া তিনি প্রচার করিলেন যে তাঁহাদের শিবতুল্য জামাতা বাবাজী স্নান

করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া শিব-মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন এবং সেখানে যোগ-সাধনা করিতেছেন। তিনি যতক্ষণ না বাহির হন তাঁহাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। শ্বশুর বাড়ীতে এ কথা খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল না—কারণ তাঁহাদের জামাতা যে ঠিক সাধারণ জামাতা নহেন এ উপলব্ধি তাঁহাদের ছিল।

শ্রীশ্রীবাবা সেই মন্দির মধ্যে বোধ হয় সারারাত্রি ছিলেন এবং সকালে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু-যুগল তখন ঘোর রক্তবর্ণ, সমস্ত শরীর অন্যূন ১৪ ঘণ্টার যোগক্রিয়ার ফলে অসাধারণ রূপে অভিষিক্ত। বিষের চিহ্নমাত্র আর তখন তাঁহার শরীরে ছিল না, তবে ক্ষত স্থান ঠিকই ছিল। এই ক্ষতটি, অর্থাৎ দুইটি দাঁত ফুটাইবার চিহ্ন, তাঁহার শরীরের অঙ্গরূপে শোভা পাইত, যেমন শোভা পাইত শ্রীকৃষ্ণের বুকে ভৃগু-পদ-চিহ্ন।

(৬)

এই কাহিনীটির পরিশিষ্টরূপে একটি কথা মনে হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ-বাসরে তাঁহার অলৌকিক বিভূতির কিছু প্রকাশ দেখান তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য হইয়াছিল! তাঁহার যে শ্যালকটি তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাঁহার সর্পদংশনের সাথী হইয়াছিলেন তাঁহার অন্তরে শ্রীশ্রীবাবা সম্বন্ধে কোনও রূপ দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন না থাকিলে কখনই এরূপভাবে তাঁহাকে একাকী মন্দিরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে অথচ দরজা খুলিতেছে না—

ইহাতে সাধারণ মানুষ তাহার মানুষী বুদ্ধিতে ইহাই স্থির করিত যে মন্দিরের ভিতরে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন সর্পের বিষে তাঁহার আর উঠিবার ক্ষমতা নাই এবং এইজন্যই দরজা খুলিতেছে না। সমস্ত ঘটনাটি পার্থিব জগতের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিচার করিলে শ্রীশ্রীবাবার এই শ্যালকটি অলৌকিকভাবেই তাঁহার বিশ্বাসকে বজায় রাখিয়াছিলেন, ইহাই বলিতে হয়। শ্রীশ্রীবাবার বিভূতিগুলি জগতের এইরূপ মহান্ উপকারের জন্যই প্রকাশ পাইত, এই কথা স্বতঃই মনে আসে। আমরা রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ নহি। কর্ম্মসূত্র অতি জটিল ব্যাপার। তাহা হইতে আরও জটিল ব্যাপার মহাপুরুষদের কর্ম্মাচরণ। তবু এই কথা কেবলই মনের মধ্যে আসিয়া পড়ে যে মহাপুরুষদের জীবনে বিভূতির খেলা জগৎকেই বিভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলে, জগতের জড়ত্ব ঘুচায়, মানুষকে মানুষীবুদ্ধি হইতে পরিত্রাণ করে।

(৭)

শ্রীশ্রীবাবা এই মানুষী বুদ্ধির কবলে কদাচিৎ পড়িয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সমস্ত জীবনের ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াও তাঁহাকে কোথাও এই মানুষীবুদ্ধির কবলিত হইতে দেখি নাই। ভয়, লোভ, সংশয়, অধৈর্য্য ইত্যাদি কখনও তাঁহাকে কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছে এমন ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। শুধু তাহাই নহে, মানুষের স্বাভাবিক বিচারশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার নিজ স্বভাবের দ্বারা। বাবার এই স্বাভাবিক বিচার শক্তি এত অন্তর্মুখীন ছিল যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১২।১৩ বৎসরে রচিত তাঁহার গানগুলি—গীত-রত্নাবলীতে

সংগৃহীত—তাহার সাক্ষ্য দেয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাইয়াছি যেখানে দেখা যায় লেশমাত্র মানুষীবুদ্ধি তাঁহার বিচার বুদ্ধি ও আচরণকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে ; আমাদের মত জড়, পরিপূর্ণ বহির্মুখ ও স্থূল সত্তার সঙ্গ করিবার জন্য আমাদের মত মানুষের আচরণের আভাস একটু দেখাইয়াছিল, ইহাও হয়ত বলা যায়। ঘটনাটি আমার কাছে তাই খুব মধুর লাগে।

শ্রীশ্রীবাবাকে যখন আমাদের পূজ্যপাদ পরমগুরুদেবের নির্দ্দেশে সংসারে ফিরিতে হইল তখন তাঁহাকে জ্যাঠাগুরুদেব অনেক কথাই বলিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি কোথায় তাঁহার বিবাহ হইবে, সেখানকার নাম ধাম ইত্যাদি সবই জানাইয়াছিলেন। আমাদের মাতাঠাকুরাণীরও পরিচয় শ্রীশ্রীবাবা অনেক পূর্ব্বেই জানিতেন। বিবাহ-সম্বন্ধ যখন স্থির হইল তখন শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরু-দেবের কথাগুলি এইভাবে মিলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে নিশ্চয়ই আনন্দ হইয়াছিল। অবশ্য ইহা আমার অনুমান মাত্র, কারণ আমাদের মানুষীবুদ্ধি পরিপূর্ণ জীবনে এইভাবে কিছু মিলিয়া গেলে আমাদের খুবই ভাল লাগে। যাহা হউক, বিবাহের পর দ্বিরাগমন। বৈশাখ মাসে দ্বিরাগমন করিয়া আমাদের শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবা বণ্ডুলে আসিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া তাঁহার সংসারের নির্লিপ্ততা পূর্ব্ববৎ অটুটই রহিল।

আমাদের ঠাকুরমাতা ঠাকুরাণী অর্থাৎ শ্রীশ্রীবাবার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার শিবতুল্য পুত্রের আচরণে ব্যথিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবার নির্লিপ্ততার পিছনে একটি রহস্য ছিল এবং তাহা শ্রীশ্রীবাবাই

নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন—গল্পচ্ছলে। আমাদের পূজ্যপাদ মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বজন্মে অতিশয় নিম্নশ্রেণীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বা কোনও উচ্চবর্ণের ত ছিলেনই না—এমন ঘরের ছিলেন যাহার জলও অচল ছিল। ইহা ছিল পূর্ব্ব জন্মের ব্যাপার। বাবা এইটি জানিতেন। এইজন্য অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক তিনি একটু আল্‌গা আল্‌গা থাকিতেন। এদিকে আমাদের ঠাকুরমাতাঠাকুরাণী অনেকদিন কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে একদিন মনে মনে শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার স্মরণমাত্রেই পূজ্য-পাদ শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেব সেখানে আবির্ভূত হইলেন ও তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার চিন্তা অপনোদনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

সেইখানেই অতঃপর শ্রীশ্রীবাবার ডাক পড়িল। ডাক শুনিয়াই বাবা সব ব্যাপার বুঝিলেন ও অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সাহত তাঁহার দাদাগুরুদেব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তখন তাঁহার দাদাগুরুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার দাদা-গুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভৃগুরাম স্বামীজী মহারাজ একটি প্রশ্ন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহার সংস্কার বড়—একজন উচ্চবর্ণে থাকিয়া সাধনা করিয়া আরও উচ্চ হইয়াছে ও অপর জন অতি নিম্ন শ্রেণীতে থাকা সত্ত্বেও পর জন্মে উচ্চবর্ণে উঠিয়া তাঁহার মত স্বামী লাভ

করিতে সমর্থ হইয়াছে ?" এই বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা অবশ্য বাক্য দ্বারা কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না—যেরূপ নীরবে ছিলেন সেইরূপ নীরবেই রহিলেন। পূজ্যপাদ জ্যাঠাগুরুদেব তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার আর চিন্তার প্রয়োজন নাই—সব ঠিক হইয়া যাইবে। যদি ইহার পরেও তাঁহার চিন্তার কোনও কারণ ঘটে তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি আবার উপস্থিত হইবেন এবং তাহার প্রতিকার করিবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামীজী মহারাজের এইরূপ আবির্ভাবে বিস্মিত ও যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার চিন্তার কারণ আর থাকিবে না এই ভরসা পাওয়াতে তাঁহার আহ্লাদ আরও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল।

(৮)

উপরকার সুন্দর ঘটনাটি ঘটিয়াছিল শ্রীশ্রীবাবার গুঙ্করা থাকার প্রথম দিকে। এইবার যে ঘটনাটি বলিতেছি তাহা ঘটিয়াছিল তাঁহার গুঙ্করা থাকার একেবারে শেষের দিকে বা গুঙ্করা ত্যাগ করার পর, অর্থাৎ ১৯১১ সালের পর। এই সময় বগুলে ৺হরহরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, নিয়মিত পূজাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাঁহার মহিমারও কিছু কিছু আভাস লোক-সমাজ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা তখন স্বয়ং বগুলে উপস্থিত রহিয়াছেন। তখনও তাঁহার স্নান বন্ধ হয় নাই। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করিতে

নিকটস্থ পুকুরে যাইতেন ও স্নান ইত্যাদি সমাপনান্তে একটু আলো হইতে হইতে বাড়ী ফিরিতেন। শ্রীশ্রীবাবা যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন তাঁহার গ্রামের অন্য সকলের উঠিয়া পুকুরে যাইবার সময় হইত। আমাদের মাতাঠাকুরাণীও সেই সময় উঠিয়া গ্রামের অন্যান্য সমবয়সী সখীদের লইয়া স্নানাদি সারিতে যাইতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পান খাইবাব অভ্যাস ছিল। সকালে উঠিয়া মুখে একগাল পান লইয়া সখীদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে পুকুর পাড়ে যাওয়া তাঁহার একরূপ নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। একদিন এইভাবে পান চিবাইতে চিবাইতে এবং গল্প করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে তিনি পানের পিক ফেলিলেন। সেই পিকটি কিন্তু গিয়া লাগিল ৺হরহরির মন্দিরের সংলগ্ন প্রাচীরের গায়ে এবং সেইখানেই তাহা লালরঙের রূপ ধরিয়া নূতন পরিষ্কার দেওয়ালের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকিল।

শ্রীশ্রীবাবা স্নান সারিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে মন্দিরের দেওয়ালে এই লালরঙের ছোপটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এইটি কাহার কীর্ত্তি এবং মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। বাড়ী ফিরিয়াই তিনি তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া মন্দিরের দেয়ালের গায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ আর কখন যেন না হয় ও এই কথা যেন তাঁহার বধূমাতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাহা না হইলে ৺শিবের কোপে পতিত হইতে হইবে।

আমাদের ঠাকুরমাতাঠাকুরাণী মাতাঠাকুরাণীর ফিরিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ফিরিতেই তাঁহাকে

সব কথা বলিলেন ও পানের দাগটিকে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে বলিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নিজের কৃত কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চয় লজ্জায় অধোবদন রহিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জল লইয়া খুব যত্ন সহকারে দাগটি তুলিয়া ফেলিয়া অন্য কাজে হাত দিলেন। কিন্তু ঘটনার সমাপ্তি এখনও হইল না। শ্রীশ্রীবাবা অবশ্য মন্দির-গাত্র পরিষ্কার হইয়াছে জানিয়া খুশী হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তখন গভীর রাত্রে মহানিশার ক্রিয়াতে রত থাকিতেন। সে রাত্রেও সেই ভাবেই একান্তে নিজ মন্দির মধ্যে রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাটীর অন্দরে নিজ গৃহে ঘুমাইতেছেন। শিশুরা তাঁহার সঙ্গে শুইয়া ঘুমাইতেছে। মধ্য-রাত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠ্যাকুরাণী হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন যে ঘরের মধ্যে কে একজন দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার চেহারা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই রুক্ষ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি এবং এই লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সে তাঁহাকে শাসাইতেছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ভীষণ ভয় পাইলেন ও শ্রীশ্রীবাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তখন সেখানে আগমন করিলেন এবং সেই ব্যক্তিটিকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সে যেন শ্রীশ্রীবাবার কথা শুনিয়াও শুনিতে চাহে না—বার বার বলিতে থাকে 'আবার প্রাচীর অপরিষ্কার করিলে রক্ষা রাখিব না।' যাহা হউক, সে অবশেষে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল ও বাবাও সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীর যেন ধরে প্রাণ আসিল এবং

সাহসে ভর করিয়া ছেলেরা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া শুইয়া পড়িলেন ও ভয়ে ভয়ে বাকী রাতটুকু কাটাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা এই ব্যাপারটি পরদিন শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে শিবের ভৈরব ভীষণ চটিয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইতে বাধ্য না করিলে সে না জানি কি করিয়া বসিত। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীবাবা মহানিশার ক্রিয়াতে রত থাকা অবস্থাতেই ভৈরবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাহির হইতে অন্দরে লৌকিকভাবে আসিলে বাড়ীর সকলেই জাগ্রত হইত—কিন্তু তাঁহার আগমন কেহই জানিতে পারে নাই, কোনও দরজাও কেহ খুলে নাই।

শ্রীশ্রীবাবা এই গল্পটি এত রসাইয়া রসাইয়া বলিতেন যে সকলের মুখে হাসি ধরিত না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্পূর্ণতঃ গ্রামের মানুষ ছিলেন। কথাবার্ত্তাতে তাঁহার গ্রাম্যতা অতিমাত্রায় ছিল। শ্রীশ্রীবাবা মাতাঠাকুরাণীর গ্রাম্য ভাষার অনুকরণে যখন তাঁহার কথাগুলি বলিতেন তখন হাস্য কলরোলে ঘর মাতিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পরদিন সকালে তাঁহার সখী-মহলে রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে কোনও ডাকাত টাকাত আসিয়াছিল। ৺ভৈরব বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাই গল্প করিয়াছিলেন—"মিন্‌ষে দুর্গার বাবাকে দেখেও যাইতে চাহে না, কেবল লাঠি ঠক্‌ঠকায় আর আমার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চায়। শেষে দুর্গার বাবা ধম্‌ক্ দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলে ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল, আর আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।"

(৯)

শ্রীশ্রীবাবা এ জগতের লোক নহেন। তাঁহার আবির্ভাব এ জগৎকে অলৌকিক করিয়াছে ও অগ্রগতির পথে আগাইতে সাহায্য করিয়াছে। এক দৃষ্টিতে তাই তাঁহার সমগ্র জীবনটাই এক অলৌকিক ব্যাপার। তাহা সত্বেও তিনি এই জগতেরই মানুষ। কারণ তাঁহার অঙ্গের অংশরূপে তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত জীবগুলি এখনও পূরাপূরি মানুষই। এই লৌকিক ও অলৌকিক সমন্বয় অন্য কাহারও জীবনে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। তাঁহার যোগদর্শনও তাই প্রচলিত যোগ-দর্শনের সহিত সব স্থলে ঠিক মিলে না। এখানেও ঠিক সেই সমন্বয় রহিয়াছে যাহার দ্বারা জীবের আধারে ভগবৎ-শক্তির ক্রিয়া অনায়াসে হয়। আমরা তাঁহাকে এক খণ্ড-মূর্ত্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইতেছিলাম। ইহা তাঁহার স্বরূপের পরিপন্থী ছিল। কাজে কাজেই আমাদের চক্ষের সামনে সে ভুলটি তিনি ভাঙিয়াছেন। তিনি নিজ খণ্ড-মূর্ত্তি ধরিয়াও আজ সর্ব্ব-ব্যাপী সত্তা। এই সর্ব্বব্যাপী সত্তার বোধ যখন আমাদের জাগিবে তখন আবার তাঁহার মূর্ত্তরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইবে। অন্ততঃ এই আশাই জাগিয়া রহিয়াছে এই ক্ষুদ্র জীব সত্তাটির প্রাণের ক্রন্দনে।

নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ,
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

জয়তি পরগুরুঃ শ্রীশৈলজা-যুক্তদেহো
রজনিরমণ মৌলির্যোগিরাজাধিরাজঃ।
জয়তি চ নরমূর্ত্তির্দেবদেবঃ স এব
বিতত-বিপুল-ভূতিঃ শ্রীবিশুদ্ধাভিধানঃ॥

আরোপ সাধন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

(১)

সাধনা বহু প্রকার আছে এবং সাধকের অধিকার অনুসারে প্রত্যেকটি সাধনার সার্থকতা আছে। সাধকের যেমন যোগ্যতার তারতম্য আছে, তেমনি তদনুসারে সাধনের ফলগত তারতম্যও আছে। যাঁহারা সাধনার ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহারা তটস্থ দৃষ্টিতে তারতম্য, অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধক নিজে তটস্থ দৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহা ধারণা করিতে পারে না। রুচি ও শক্তির বিকাশ অনুসারে যে সাধক যে মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন পথে চলিতে থাকে তাহার নিকট তৎকালে সেই মার্গের লক্ষ্যই সাধনার চরম সিদ্ধি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অন্য মার্গের সহিত তুলনা করিয়া তারতম্য বিচার করার সামর্থ্য তাহার থাকে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং ইহা স্বাভাবিক। তবে স্থিতি বিশেষে ইহার ব্যভিচারও যে দৃষ্ট হয় না তাহা নহে।

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরোপ-সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি যাহা বলিব তাহা যদিও কোন বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়াই বলিব তথাপি তাহার মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা অবস্থা বিশেষে অন্যান্য সাধন-পদ্ধতিতেও আংশিকভাবে লক্ষিত হইতে পারে। আরোপ-সাধন

যোগি-সমাজেও অত্যন্ত নিগূঢ় সাধন রূপে স্বীকৃত হয়—ভাগ্যবান্ ভক্ত ভিন্ন অপর কেহ ইহার রহস্য অবগত নহে। প্রচলিত অধিকাংশ সাধন আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়,—আত্মদর্শন হইলেই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে মনে করিয়া অগ্রিম পথে আর কেহ অগ্রসর হয় না। এই আত্মদর্শন প্রাথমিক আত্মদর্শন, পূর্ণ আত্ম-দর্শন নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে আত্মাকে দর্শন করাই প্রাথমিক আত্মদর্শনের উদ্দেশ্য। এই প্রারম্ভিক আত্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত আরোপ-সাধনের সূত্রপাতই হয় না। আরোপ-সাধনের ফলে যে পূর্ণ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় তাহা অদ্বৈত আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি। তাহা বহুদূরবর্ত্তী আদর্শ। কিন্তু প্রাথমিক আত্মদর্শনও সাধন পথে অতি উচ্চ অবস্থার সূচনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, আরোপ-সাধনের বৈশিষ্ট্য ইহা হইতে কিয়দংশে অনুমিত হইতে পারে।

দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ইষ্টমন্ত্র দান করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। বস্তুতঃ গুরু যে বাহির হইতে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় শিষ্যকে শব্দ-বিশেষ শুনাইয়া দেন তাহা নহে—তিনি দীক্ষার সময় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামি-রূপে শব্দব্রহ্মময় জ্ঞান দান করেন। এই জন্যই দীক্ষাদাতা গুরুকে জ্ঞানদাতা রূপে শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান, কারণ ইহা শব্দ হইতে উত্থিত হয়।

জ্ঞান দুই প্রকার। একটি শব্দজ অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরুর উপদেশ-বাণী হইতে শিষ্যের হৃদয়ে পরোক্ষরূপে উদ্ভূত। ইহাকে আগমোত্থ অথবা আগমজন্য জ্ঞান বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে

ঔপদেশিক জ্ঞান বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান শব্দ হইতে উত্থিত হয় না অর্থাৎ গুরু বাক্য হইতে জন্মে না, কিন্তু শিষ্যের বিবেক হইতে আপনা আপনি উদ্ভূত হয়। ইহাকে বিবেকজ জ্ঞান বলে—প্রাতিভ জ্ঞান ইহার নামান্তর। ইহা অনৌপদেশিক। কারণ ইহা অন্যের মুখ-নিঃসৃত উপদেশ-বাণী হইতে উৎপন্ন হয় না। এইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সদ্‌গুরুর বিশিষ্ট কৃপার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই তারক জ্ঞান—ইহার অবিষয় কিছুই থাকে না। ইহাতে একই ক্ষণে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সকল পদার্থের সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। এই জ্ঞানে ক্রম থাকে না, দেশগত অথবা কালগত ব্যবধানের প্রশ্ন থাকে না,—সর্ব্বজ্ঞত্ব ইহারই নামান্তর। গুরুর মৌখিক উপদেশ হইতে এই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। এই মহাজ্ঞানের সঞ্চার-কালে সদ্‌গুরু বাহ্যতঃ কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না, কিন্তু মৌনী থাকেন, অথচ ইহার এমনি প্রভাব যে ইহাতে যাবতীয় সংশয় ছিন্ন হইয়া অখিল কর্মবন্ধন ক্ষীণ হয় এবং হৃদয়ের মর্ম্ম-প্রবিষ্ট গ্রন্থি সকল ছিন্ন হয়। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ।"

পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করার পর সাধকের চিত্তে যতদিন পর্য্যন্ত ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুলতা না জন্মে ততদিন সদ্‌গুরুর কৃপার উদয় হয় না এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। কঠোর তপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধন, অভাবের বেদনা, লাঞ্ছনা, আধি ও ব্যাধি এবং নানা প্রকার পরীক্ষা অতিক্রম করিতে না পারিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য উৎকট তৃষ্ণা জন্মে না। গুরুর মঙ্গলময়

ইচ্ছাতে সাধককে বহু প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কেহ কেহ এই সকল অবস্থাকে প্রারব্ধের ফল-ভোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নানা প্রকার প্রলোভন এবং পরীক্ষা দ্বারা সাধকের চিত্ত প্রকৃত সত্যের অন্বেষণের পথে জাগ্রত থাকে। অনেক সাধকের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা এই সময়েই হইয়া থাকে। যাহার চিত্তে যে অংশে দুর্ব্বলতা তাহার সেই অংশেই সাধারণতঃ পরীক্ষা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভক্ত mystic গণের বর্ণনা অনুসারে এই সময়টীকে Dark Night of the Soul, এমন কি Dark Night of the Spiritও, বলা যাইতে পারে। ইহা সত্যই গভীর অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময় ও আতঙ্কপ্রদ। প্রবল উৎকণ্ঠা, গুরুর আদেশানুসারে যথাশক্তি সাধনার চেষ্টা, নৈতিক জীবনের মহান্ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাব মধ্যেও ধৈর্য্য ও সহনশীলতার দ্বারা নিজের চিত্তকে সংযত ও স্থির রাখিতে চেষ্টা করা এবং সর্ব্বোপরি অবশ্যম্ভাবী গুরু-কৃপার উপর অটল শ্রদ্ধা রাখিয়া তাহার জন্য একান্ত-মনে প্রতীক্ষা করা—ইহাই এই সময়ের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই অবস্থার মধ্যে অতর্কিতভাবে সদ্‌গুরুর মহাকরুণা আত্মপ্রকাশ করে এবং সাধকের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দময় চৈতন্যের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। অত্যন্ত উত্তাপময় গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে নব বর্ষার সূত্রপাত হইলে তাপ-ক্লিষ্ট জীব-জগৎ যেমন উৎফুল্ল হয়, ঠিক সেই প্রকার দীর্ঘকালের অবসাদ ও নৈরাশ্যের পর গুরু-কৃপার আবির্ভাব হইলে সাধকের চিত্তও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি

শান্ত ও স্থির আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়—যে জ্ঞানে সংশয় অথবা বিকল্পের স্থান নাই। সূর্য্যের উদয় হইলে তিমির-রাশি যেমন ঐ কিরণের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া অপসারিত হয়, তদ্‌রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে চিত্তস্থিত অনাদিকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। শব্দব্রহ্ম হইতে শব্দাতীত পরব্রহ্মের অধিগম এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

এই পরব্রহ্মরূপী আত্মা বা সাক্ষী নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ। ইনি মানবের দেহে ও বিশ্বে সর্ব্বত্র অসঙ্গভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, দেশ কাল ও আকৃতির বন্ধন ইঁহাতে নাই। তাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ও সর্ব্ব আকারের মধ্যে ইনি সমরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু এমনই অদ্ভুত রহস্য যে ইনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না। এক খণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল পর কুণ্ড হতে উঠাইয়া লইলে যে অগ্নিময় লৌহ-খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে একাধারে যেমন অগ্নিও আছে ও লৌহও আছে, উভয়ই পরস্পর মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্‌রূপ একই আধারে দেহ ও আত্মা দুই-ই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অপৃথক্‌ভাবে বা মিশ্রভাবে, কারণ দেহ হইতে আত্মাকে অথবা আত্মা হইতে দেহকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র গুরূপদিষ্ট কর্ম্ম-কৌশলে এই আত্ম-বস্তুকে দেহ হইতে বা প্রকৃতির অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করা যায়। ইহাই বিবেক-জ্ঞানের উদয়, যাহা এক হিসাবে আত্মদর্শন নামে সাধক-সমাজে পরিচিত। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই

সাক্ষাৎকার। ইহারই নাম জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন। এই সময়ে দীক্ষা-কালে প্রাপ্ত পরোক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। আরোপ সাধক যোগিগণ এই সাক্ষিস্বরূপ চিন্ময় সত্তাকে তাঁহাদের সরল ভাষায় 'বর্ত্তমান' নামে অভিহিত করেন। এই 'বর্ত্তমান' প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তার একমাত্র সমন্বয়-ভূমি। গীতোপদিষ্ট উত্তম পুরুষে বা পরমাত্মাতে যেমন ক্ষর ও অক্ষর উভয় সত্তার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্রূপ এই নিত্য বর্ত্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তাই বিরাজ করিতেছে। তাই আরোপ সাধক বলেন—

'সাক্ষিভুত বর্ত্তমান দাঁড়ায়ে সাক্ষাতে,
নিরাকার ও সাকার এই দুই দেখ তাতে।'

এই বর্ত্তমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়, কারণ এই বর্ত্তমানই জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ও ইহাকে অভিব্যক্ত করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। কর্ম যেমন জ্ঞানের উদয়ে সার্থক হয়, তদ্রূপ জ্ঞানও জ্ঞেয় আবিভূ'ত হইলে সার্থক হয়। জ্ঞেয়ই ইষ্ট, সুতরাং কর্ম ও জ্ঞানের প্রভাবে ইষ্টের আবির্ভাব হইলে সাধক উভয়ের অতীত এক অভিনব উন্নত স্তরে প্রবেশ লাভ করেন। যে সাধক এইখানেই নিবৃত্ত হন তাঁহার পক্ষে পরবর্ত্তী অবস্থার প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থা আত্মদর্শন হইলেও ইহা যে পূর্ণ আত্মদর্শন নহে এবং এ অবস্থাতে স্থিতি যে অখণ্ড আত্মস্বরূপে স্থিতি নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

(২)

এইবার সাধকের জীবনে প্রেমের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন কর্ম হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইতে প্রেম হয়। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রস-সাধনার সূত্রপাত হইতে পারে না। রস-সাধনার জন্য ভাবের বিকাশ আবশ্যক এবং ভাবের বিকাশের জন্য তৎপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক, কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলেই ভাবের উদয় হইতে পারে না, তাহার জন্য আনুষঙ্গিক সাধনা আবশ্যক। এইবার আমরা সেই আনুষঙ্গিক সাধনার পরিচয় দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আমরা যাহাকে আরোপ-সাধনা বলিয়াছি পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞান লাভের পরেই তাহার অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়, এবং এই আরোপ সাধনার ফলেই পূর্ণ আত্মস্বরূপে স্থিতি, আত্মারাম অবস্থা লাভ, নিত্য লীলার আস্বাদন প্রভৃতি মনুষ্যের পরাৎপর পুরুষার্থ সকল সিদ্ধ হয়।

সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছাদে উঠিতে পারিলে ঐ সিঁড়ির প্রয়োজন যেমন আর থাকে না, তেমনি কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন আর থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞেয়ই ইষ্ট—ইনি সদা ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান পুরুষোত্তম। কৃষ্ণ-উপাসকের ইনি নিত্য কৃষ্ণ এবং রাম-উপাসকের ইনি নিত্য রাম। সকল উপাসকেরই আপন আপন ইষ্টরূপে ইনিই একমাত্র উপাস্য।

দীক্ষাকালে যে শব্দ মন্ত্রদাতা গুরুর মুখ হইতে শিষ্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল সদ্‌গুরুর কৃপায় সেই শব্দই আজ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় জ্ঞেয়রূপে অথবা চিন্ময় ইষ্টরূপে প্রকাশমান হইয়াছে। বৈখরী বাক্ আজ পশ্যন্তী ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছে। ক্রিয়া, মন্ত্র,

জপ প্রভৃতি সার্থক হইয়াছে, কারণ যে বস্তু এতদিন শুধু শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ছিল আজ তাহা নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রবণ-জাত জ্ঞান সাক্ষাৎ দর্শনে পরিণত হইয়াছে। এখন আর পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াদির প্রয়োজন নাই। কারণ আত্মভাবে নিষ্ঠা জন্মিলে সাধকের সকল চেষ্টা অর্চ্চনাতে পরিণত হয় এবং সকল বাক্যই মন্ত্র-জপের তুল্যতা লাভ করে।

এই বর্ত্তমান রূপই আরোপ সাধকগণের পরিভাষাতে **'শ্যামবিন্দু'** নামে পরিচিত। জগতের অনন্ত রূপ, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ কাল, দূর ও নিকট যাবতীয় দেশ, সবই এই নিত্য বর্ত্তমানে অভিন্নভাবে স্থিত রহিয়াছে। এই রূপের উদয় হইলেই জগৎ আলোকিত হয় এবং ইহার তিরোভাবের ফলে জগৎ আচ্ছন্ন হয়।

এইরূপটি অতি গুপ্ত এবং গুহ্য। যদিও ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে, তথাপি আবরণে আবৃত বলিয়া সকলের চক্ষে ইহা ভাসে না। দ্রষ্টার চক্ষুতেও আবরণ আছে, আবার বস্তুর স্বরূপেও স্ব-কল্পিত আবরণ আছে। অখণ্ড সত্তার প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আবরণ থাকা স্বাভাবিক। আত্মদর্শনের পর এই দৃষ্টিগোচর আত্মস্বরূপকে নিয়ত ভজন করা আবশ্যক। ইহা কর্ম্মের অঙ্গভূত উপাসনারূপ ভজন নহে, ইহা নিত্য ভজন—ইহাতে দিক্, দেশ ও কালের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। ইহাতে দশাগত, বর্ণগত, পরিমাণগত এবং লিঙ্গগত কোন ভেদ নাই। ইহা চিন্ময়, সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বাকার। সাধকগণ ইহাকে নিষ্ক্রিয় ভজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ইহা সর্ব্বাকার হইলেও সাধক স্বয়ং মনুষ্যরূপী বলিয়া নিজের ইষ্টকে পাইলেই তাঁহার ভজনের অনুকূলতা জন্মে। সেইজন্য সাধকের কল্যাণ কামনায় তাঁহার জ্ঞেয় বা ইষ্ট মনুষ্যাকার হইয়া প্রকাশিত হন। মনুষ্য-আকারের বৈশিষ্ট্য এই যে সাধক নিজে মনুষ্য বলিয়া এই ইষ্ট আকার প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজেরই আকার অথবা নিজের সহিত অভিন্ন আকাররূপে প্রতিভাসমান হয়। তখন ভক্ত সাধকের নিজ দেহের প্রতি যে সেবা বা পরিচর্য্যা করা হয় তাহা তাঁহার ইষ্টের পরিচর্য্যারূপে পরিণত হয়। ভক্তের রূপ ও তাঁহার ভজনীয়ের রূপ পৃথক্ হইয়াও তখন অপৃথক্‌ভূত, উভয়ই তখন সমসূত্র। ইষ্ট তখন ভক্তের সঙ্গে যোগে থাকিয়া অনুরাগে অনুষ্ঠিত ভক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম তখন মনুষ্যাকার বা নররূপী। ভক্ত মনুষ্য, তাই ভগবান্ মনুষ্য, উভয়ে কোন ব্যবধান নাই।

এই নিত্য বর্ত্তমানের দর্শন অপরিসীম ভাগ্যের কথা, গুরু কৃপার পরাকাষ্ঠা এই দর্শনেই জানিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্য বর্ত্তমানে ত্রিকালই ভাসে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ত্রিকাল কোথায়? একমাত্র বর্ত্তমানই ভূত-ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়া নিজের অসম প্রভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এইজন্যই সাধক যে কোন অবস্থাতে এই স্থিতি লাভ করেন ঐ অবস্থা তাঁহার পক্ষে আর অবস্থা থাকে না, উহা নিত্য বর্ত্তমানরূপে প্রকাশিত হয়। তাই ভজনের প্রভাবে ঐ অবস্থা বা দশা বিকার-রহিত হইয়া নিত্য অথবা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করে। তখন উহা কালের দশারূপে পরিগণিত হয় না—উহা কালাতীত হয়। এটিকে নিত্য

দেহ বলে। যে দেহ যে বয়সে যে রূপে ভজন করে তাহাই নিত্য দেহরূপে প্রকট হইয়া থাকে।

(৩)

আরোপ সাধনা অভ্যাস-সাপেক্ষ। এই অভ্যাসের ক্রম আছে। স্থূলভাবে এই ক্রমের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিতেছি।

(ক) সাক্ষিভূত সম্মুখস্থিত বর্ত্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তা দেখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক।

(খ) মনের উৎকণ্ঠা এবং প্রাপ্তির লালসা যাহাতে ক্রমশঃ অধিকতর তীব্র হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বিষয় ও বিষয়ীর সংসর্গ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলা উচিত, কারণ ইহা ভজনের অন্তরায়-স্বরূপ। আকাঙ্ক্ষা যাহার যত তীব্র হইবে প্রাপ্তি তাহার তত নিকটবর্ত্তী জানিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া হৃদয় হইতে আশার কণিকা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে হইবে, অর্থাৎ আশা না রাখিয়া শুধু আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইতে হইবে।

(গ) একান্ত-বাস এই সাধনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। যত অধিক সময় সম্ভবপর হয় নির্জ্জন স্থানে অবস্থানের চেষ্টা করা উচিত। লোক-সংসর্গ যথাশক্তি বর্জ্জনীয়, কারণ উহাতে শক্তি-ক্ষয় হয়। একান্ত স্থানে থাকিবার সময় এমনভাবে অবস্থান করিবে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়। দেহটিকে যে কোন প্রকারেই হউক স্থির রাখার অভ্যাস করা উচিত। প্রোথিত

স্তম্ভ যেমন নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকে দেহকে তাহার অনুরূপ-ভাবে স্থির রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

(ঘ) দেহ-স্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সর্ব্বদা যথাশক্তি ভ্রূমধ্যে ধারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহারই সহকারিরূপে নিমেষ ও উন্মেষ বর্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য চক্ষুর পলক যাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত না পড়ে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহার নাম 'নিমেষ-বর্জ্জন'। পক্ষান্তরে অভ্যাসের সময় তন্দ্রা ও নিদ্রার আবেশ যাহাতে না হয় যে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। নিমেষপাত ও ক্ষণমাত্রের জন্য তন্দ্রার উদয় আদর্শ-প্রাপ্তির অন্তরায় স্বরূপ। নিমেষ বা পলক পড়িবার আশঙ্কা হইলে চক্ষুকে শিথিল করিয়া রাখা উচিত। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইচ্ছানুরূপ নিমেষ-বর্জ্জন আয়ত্ত হয়। ইহা একটি উচ্চ অবস্থা। এইভাবে মন স্থির হয়, বায়ু স্থির হয়, এবং অপ্রার্থিত হইলেও সিদ্ধি সকল আয়ত্ত হয়। আরোপ সাধক কৃত্রিম ভাবে প্রাণায়াম বা কুম্ভকাদির অভ্যাস করেন না—তাঁহার প্রাণ স্বাভাবিক রীতিতে উপশম প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য হঠ-যোগাদি-সাধ্য প্রাণায়াম ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয় না।

(৪)

মন, বায়ু ও দৃষ্টি স্থির হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইল। যখন এই স্থিতি লাভ সম্পন্ন হইবে তখনই পরবর্ত্তী সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে! ইহার নাম 'লক্ষ্য-বেধ'। লক্ষ্য কাহাকে বলে? সাধকের হৃদয়নিষ্ঠ গুরুদত্ত ইষ্টরূপই লক্ষ্য। এই অন্তঃস্থিত রূপকে চক্ষুর্দ্বয়ের বাহিরে আকর্ষণ করিয়া

আনিতে হইবে এবং সম্মুখে স্থান-বিশেষ স্থাপন করিতে হইবে। যাহা হৃদয়-আকাশে গুপ্তরূপে নিহিত ছিল তাহাকে বাহির করিয়া বহিরাকাশে ব্যক্তরূপে স্থাপন করিতে হইবে। হৃদয়-আকাশ* ও বহিরাকাশের যেটি সন্ধি তাহাই লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান বা কেন্দ্র। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে অধিক রহস্য প্রকাশ করা উচিত মনে করিলাম না। সন্ধির ওপারে স্থির বায়ু এবং এপারে চঞ্চল বায়ু। চঞ্চল বায়ুর সীমার বাহিরে স্থির বায়ুর প্রান্ত ভূমিতে লক্ষ্যকে স্থাপন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ভ্রূ-মধ্যে স্থিরীভূত মনকেও ঐস্থানে বসাইবে। নিমেষ ত্যাগ করার অভ্যাস পূর্ব্বে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এবার দৃষ্টিকে নিমেষ-বর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্যস্থানে সন্ধান করা আবশ্যক। ইহার ফলে মন, নেত্র ও লক্ষ্য এক হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহার নাম লক্ষ্য-বেধ†। লক্ষ্যবেধের সময় মনে যাহাতে অন্য ভাব না থাকে এবং দৃষ্টিতে অন্য কিছু না ভাসে তাহার জন্য অবহিত থাকা আবশ্যক।

---

*ইহা যোগিগণের পরিচিত লক্ষ্যত্রয়ের অন্তর্গত বহির্লক্ষ্যের প্রকার ভেদ মাত্র।

†মুণ্ডকোপনিষদে প্রকারান্তরে লক্ষ্যবেধের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দেহ সাধকের ব্রহ্মই লক্ষ্য, আত্মাই শর এবং প্রণবই ধনুঃ। প্রণব দ্বারাই ব্রহ্মে আত্মাকে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। লক্ষ্যবেধের নিদর্শন সূতসংহিতাকার এইভাবে দেখাইয়াছেন —

লক্ষ্যং সর্বগতং চৈব পরোক্ষং সর্বতোমুখম্।
বেদ্ধা সর্বগতশ্চৈব বিদ্ধং লক্ষ্যং ন সংশয়ঃ॥